দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

আসানসোল কেন্দ্রে বিরোধীদের ঘুম কেড়ে নেওয়া বিজেপি প্রার্থী

বাবুল সুপ্রিয়

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

এরাজ্যে বাঙালি মুসলমানদের একটা অংশ এবার পদ্মফুলে বোতাম টিপলে অবাক হওয়ার কিছু নেই □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : একটি আগাগোড়া সাম্প্রদায়িক আবেদন □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

বিচারপতি নিয়োগ □ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১২

সাক্ষাৎকার : বাংলা থেকে যত বেশি বিজেপি সাংসদ যাবেন, রাজ্যের বিকাশের ততই সুবিধা হবে : বাবুল সুপ্রিয় □ ১৪

অস্তিত্ব সঙ্কটে হিন্দু বাঙালি □ ডা: দুলালকৃষ্ণ দাস □ ২০

রবীন্দ্র পদ্যকাব্যে উপনিষদের প্রভাব □ ড: সীতানাথ গোস্বামী □ ২১

ভোটকথা □ ২৭-২৮

আমূল ও হিমূল : মোদী বনাম মমতা সরকার □ বাসুদেব পাল □ ২৯

হিন্দু শব্দটি শুনলেই তাদের কান গরম হয়, চোখ লাল হয়, হিন্দুত্বই যে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক তত্ত্ব তা মানতে রাজি নয় □ অমলেশ মিশ্র □ ৩২

গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সত্তা-সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই শুরু □ এন সি দে □ ৩৫

লোকসভা নির্বাচন - ২০১৪ : পথে চলতে চলতে যা জানা যাচ্ছে □ দেবব্রত চৌধুরী □ ৩৭

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ - ১৪ - ১৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ □ **অঙ্গনা : ২৬** □ □ **অন্যরকম : ৩৩**

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ২১ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ৫ মে - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬

৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,

৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১২ই মে ২০১৪

প্রকাশিত হবে ১২ই মে ২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ইউ পি এ হারছে

নির্বাচনের আগেই হেরে বসে আছে কংগ্রেস। তারা জানিয়েছে কেউ মোদী-বিরোধী সরকার গড়তে চাইলে সবরকম মদত দেবে। অর্থাৎ ভারত শাসনের রজ্জু আর তাদের হাতে থাকছে না। অন্যদিকে দেশজুড়ে বইছে মোদী-ঝড়।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

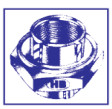

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

মোদী বিরোধিতায় সব কলঙ্কিত নায়কদেরই এক রা

কংগ্রেস এবং সিপিএমের সততার বেলুন বহু পূর্বেই চুপসিয়া গিয়াছিল, এবার তৃণমূল কংগ্রেসেরও সততার মুখোশ খুলিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস নিশ্চিন্ত রহিয়াছে তাহারা নাকি একশত আসন পাইবে এবং তাহা পাইলেই মোদীকে রুখিয়া দিতে পারিবে। তাই এইবার সব চোর এক হইয়া মোদীকে রুখিবার জন্য আক্রমণ করিতেছে। কংগ্রেস যদি একশত প্রার্থীকে সংসদে জেতাইয়া আনিতে পারে তাহা হইলে সিপিএম, তৃণমূল, জয়ললিতা, করুণানিধি, লালুপ্রসাদ, মুলায়ম প্রমুখ সকলে মিলিয়া সরকার গড়িবে। অর্থাৎ একপক্ষে সকল কলঙ্কিত কেলেঙ্কারির নায়করা আর অন্যদিকে একমাত্র নরেন্দ্র মোদী। সেই মহাভারতের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি। একপক্ষে দুর্যোধন দুঃশাসন-সহ অধার্মিক রথীমহারথীরা, অন্যদিকে একা পাণ্ডব পক্ষ। কিন্তু যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। ধর্মের জন্য একজন মানুষই লড়াই করিয়া জয়ী হইয়া থাকে এবং চিরকাল তাহাই হইয়া আসিতেছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বের সময়ও একই বাধা আসিয়াছিল। তখনও কংগ্রেস-সহ সকলে অটলবিহারীজীকে থামাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেদিনের মতো আজও মোদী-তুফানকে রোখা যাইবে না। এই সত্য অনুধাবন করিতে পারিতেছেন বলিয়া অনেকেই আরও আক্রমণাত্মক হইয়া উঠিতেছেন। এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে 'তুই' 'হরিদাস' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। তাঁহাদের আচার-আচরণ কথাবার্তা সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করিতেছে, হইয়া উঠিতেছে অসামাজিক। কেজরিওয়ালের মতো নাটকবাজি নয়। এই প্রথম কোনো জননেতা প্রত্যক্ষ ভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছেন। তাহা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই হউক বা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই হউক। সাম্প্রদায়িক বলিয়া গাল পাড়িলে কলঙ্কের দাগ কীভাবে মোছা যাইবে। তাই গাল পাড়িবার ফোয়ারা ছুটিতেছে। আসানসোলের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছিলেন, অবাঙালিরা এ রাজ্যের 'মেহমান' অর্থাৎ অতিথি। প্রত্যুত্তরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, অবাঙালিরা অতিথি আর বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জামাই আদর করা হইতেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইহাতে রাগ হইবেই। তাঁহার যত সেবা আরাধনা সবই সংখ্যালঘুদের জন্য। বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রেশনকার্ড, ভোটার কার্ড সবই নিমিষে মিলিবে। অনুপ্রবেশকারীদের জন্য মুর্শিদাবাদে বাঙালি-হিন্দু সংখ্যালঘু হইয়াছে, মালদহে সংখ্যালঘু হইয়াছে, নদীয়াতে দু'এক বছরের মধ্যে বাঙালি-হিন্দু সংখ্যালঘু হইবে। বাংলাদেশে হিন্দুরা আক্রান্ত হইলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উদ্বেগ নাই, তাঁহার যত ভাবনাচিন্তা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য। অনুপ্রবেশকারী তোয়াজ করিলে তাঁহার ভোট বাড়িবে। এজন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গে জামাতে ইসলামির দপ্তর খুলিতেও প্রস্তুত। বিজেপি বারংবারই বলিতেছে সারা বিশ্বের আক্রান্ত হিন্দুরা এদেশে স্বাগত কিন্তু অন্যরা অনুপ্রবেশকারী।

এদেশে উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনীতি করিতেছে সিপিএম। মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের গুলি চালাইয়া হত্যা করিয়াছিল সিপিএম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতার আসিবার পরও বিচার হয় নাই মরিচঝাঁপি গুলিচালনার। কেন হয় নাই এই বিচার? জ্যোতি বসুদের বাঁচাইতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত আগ্রহ কেন? একমাত্র বাঙালি-হিন্দু উদ্বাস্তুর রক্ষাকর্তা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামাপ্রসাদকেই শ্রদ্ধা করেন না, তিনি আবার উদ্বাস্তু লইয়া বোলচাল মারিতেছেন কেন? আসলে দিল্লীর মসনদ দখল করিবার জন্যই কলঙ্কিতদের এই মোদী বিরোধিতা। মনমোহন সিংয়ের রাজত্বকালে কেলেঙ্কারির বিশ্বরেকর্ড হইয়াছিল। এতগুলি কলঙ্কিত নেতারা একত্রিত হইয়া সরকার গড়িলে আগামী পাঁচ বছরে দেশের অবস্থা কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

সুভাষিত

পরোপদেশবেলায়াং শিষ্টা সর্বে ভবন্তি বৈ।
বিস্মরন্তীহ শিষ্টত্বং স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে।।

অন্যকে উপদেশ দেবার সময় সকলেই সজ্জন হয়ে যান কিন্তু নিজের আচরণের সময় সকল সজ্জনতা ভুলে যান।।

শ্রীরামপুর পেল এক অন্য মোদীকে
প্রমাণও মিলল সংবাদমাধ্যমের অকুণ্ঠ প্রশংসায়

দেবাশিস আইয়ার ॥ ''৩৪ বছরের শাসনকালে বাম সরকার বাংলার যা হাল করেছে গত ৩৪ সালে তৃণমূল প্রায় তাকে ছাপিয়ে যেতে বসেছে।'' —বিজেপি কর্মীদের উৎসাহ দেবার জন্য মোদীজীর এই উক্তিটুকুই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এইটুকুতে কি মোদীজীকে আটকানো যায়, আর তাই ২৭ এপ্রিলের সন্ধেবেলা শ্রীরামপুর পেল এক অন্য মোদীজীকে। মোদীতে আমোদিত হলো শ্রীরামপুর স্টেডিয়াম মাঠ ছাপিয়ে যাওয়া ৫০ হাজার কর্মী-সমর্থক। তার প্রমাণও মিললো পরদিন সমস্ত সংবাদমাধ্যমের অকুণ্ঠ প্রশংসায়।

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র এবার বিজেপি-র সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। বাপি লাহিড়ী প্রার্থী হওয়ায় এই কেন্দ্রটি এখন বিবিসি, সিএনএন-আইবিএন প্রভৃতি বিদেশি মিডিয়াতেও আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু। এলাকার লোকেদের উৎসাহও তুঙ্গে। স্লোগান উঠেছে 'কাজ করব তৃণমূলে, ভোটদেব পদ্মফুলে'। তাই এই কেন্দ্রে মোদীজীকে নিয়ে আসাটা খুব দরকার। সেই জন্য বিজেপি-র তরফে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মোদীজীকে আনা হয়। সঙ্ঘের স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের অবদান সেখানে সব থেকে বেশি। আর এটা যে অত্যন্ত ভালো সিদ্ধান্ত তা সভা শেষে কর্মীদের মনোবল ও বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেই মালুম পাওয়া যায়। 'হর হর মোদী, ঘর ঘর মোদী' স্লোগানে রবিবারের সন্ধ্যায় শ্রীরামপুর চত্বর মুখরিত হলো।

এই দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-র ৫ জন প্রার্থীই বাপি লাহিড়ী, জর্জ বেকার, চন্দন মিত্র, মধুসূদন বাগ, আর কে মোহান্তি। এছাড়া মোজীজীর সঙ্গে এসেছিলেন সিদ্ধার্থ নাথ সিং। উপস্থিত ছিলেন রাহুল সিনহা, অমল চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য প্রমুখ স্থানীয় নেতা। মোদীজী তাঁর ভাষণের আদ্যন্ত ছিলেন আক্রমণাত্মক। বুঝিয়ে দিলেন ক্ষমতায় এলে দেশদ্রোহী কোনও শক্তিকে বরদাস্ত করা হবে না। সারদা কাণ্ডের ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্বস্ত করলেন ক্ষমতায় এলে তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। এবং তৃণমূলকে সাবধান করলেন ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে যেন বিরোধী দলগুলির প্রতি অত্যাচারের রাজনীতি না করা হয়। এরকম চললে ১৬ মে পর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর এইটুকু ভরসাই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মনোবল বাড়িয়ে দিল। আর তাই মিছিল শেষ করে ফেরার পথে তৃণমূলী হার্মাদরা আক্রমণ করলেও তা দমাতে পারেনি বিজেপি-র মনোবল। বরং এই ঘটনায় এলাকার মানুষরা বলতে শুরু করেছে ৩৪ মাসেই যেভাবে তৃণমূল বিরোধী স্বরকে দমন করছে তা ৩৪ বছরকেও ছাপাতে বসেছে।

আর তাই একটা চোরাগোপ্তা হাওয়া উঠেছে আর নয়, এবার দেখাই যাক পদ্মফুলে ছাপ দিয়ে। আর মোদীজীও বলে গেলেন আপনারা আমাকে ভোটদিন, আমি আপনাদের সুরাজ্য দেব। এখন দেখার ১৬ মে কি বলে।

মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা যতই বাড়ছে বিরোধীরা ততই বিধ্বংসী হয়ে উঠছে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন যতই অন্তিম পর্যায়ের দিকে চলেছে ততই ঘোষিত বিরোধী বা পরস্পরের সমর্থক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ কেমন যেন এলোমেলো কথাবার্তায় রাজনৈতিক পরিসরটিকে ঘোলাটে করে ফেলছেন। এর মূলে রয়েছে ভয়ে অ্যান্টনি তাঁর ভাবমূর্তি বাঁচাতে অস্ত্রশস্ত্র কেনাই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানী সৈন্য ঢুকে বীর সেনানীদের মাথা কেটে নিয়ে যাওয়ার পরও সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বিড় বিড় করে এই অবমাননাকে ধামা চাপা দেওয়ার কুচেষ্টা করেন। প্রথমত তাঁর কথাবার্তা দেশের মানুষ কিছুই বুঝতে পারে বসলেন— মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে that will be disasterous। যেন তিনি থাকাকালীন ভারত ছিল উন্নতির স্বর্ণ শিখরে। অর্থাৎ পরিচিত দু'জন ইউপিএ-র খাতায় কলমের প্রায় মূকমন্ত্রী যুগলকে মোদীর আগমন সম্ভাবনা বাচাল করে তুলল।

মনমোহন সিং

এ কে অ্যান্টনি

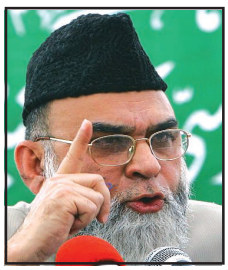

ইমাম বুখারি

প্রিন্সিপাল ফ্লেজার ম্যাসকারন্স

বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী শ্রী নরেন্দ্রভাই মোদীর দেশ জোড়া সুনাম, আবেদন ও বিশ্বাসযোগ্যতা। সঙ্গে বিজেপি-র সর্বভারতীয় নানান শাখা সংগঠনগুলির যোগ্য সঙ্গতে মোদীর নির্বাচনী প্রচার আজ এমন তুঙ্গ অবস্থানে পৌঁছেছে যার বিধ্বংসী প্রভাবে মূল বিরোধী দলগুলি প্রায় ছন্নছাড়া। আবার মোদীর এই উত্থানের একটি ভাল দিকও নজরে পড়েছে। কংগ্রেসের বেশ কিছু বড় নেতার মুখে হঠাৎ হঠাৎ বুলি সোনা যাচ্ছে। ধরুন দেশের সর্বকালীন অকর্মণ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ.কে. অ্যান্টনি-র কথা। আপনার বাড়ির গোমস্তাকে বাজারে পাঠালে সে চুরি-জোচ্চুরি করতে পারে বলে আপনি নিজের আত্মরক্ষায় বন্দুক কেনা স্থগিত রাখলেন। পরে ডাকাতের হাতে প্রাণ গেল। নিজের আমলে দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে লেনদেনে গোলমাল হওয়ার না। তিনি হিন্দি জানেনও না। জিভের জড়তা না কাটায় ইংরাজিতে যা বলেন তার অধিকাংশই তাঁর নিজের মধ্যেই তলিয়ে যায়। এ হেন অ্যান্টনি ভোটের তিন দফা না মিটতেই বলে ফেললেন— নির্বাচনের পরে বামপন্থীদের সঙ্গে চলা যেতে পারে। হারার আগে একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর হার স্বীকার করে নেওয়ার এমন কাপুরুষোচিত নজির বিরল। সেটাও বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া বলে মেনে নেওয়া যেত যদি না তিনি আবার ক্ষমতায় ফিরতে দুম করে বামপন্থীদের নাম না করতেন। অর্থাৎ তিনি জনতার ভোটে হারলেও জনাদেশ চুরি করবেনই। ধন্য ভাবমূর্তি! আবার নিজের মুখ্য মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু যে প্রধানমন্ত্রীর ধ্যান ধারণা, দেশ পরিচালনায় তাঁর মতামত সবই কংগ্রেস সভানেত্রীর কাছে বাঁধা দেওয়ার কথা অকপটে লিখেছেন সেই প্রধানমন্ত্রীই হঠাৎ অম্বলের ঢেঁকুর তোলার মতো বলে

এতো গেল 'মূকং করোতি বাচালং' পর্ব। অন্যদিকে খারাপটাও রয়েছে— দৃষ্টিশক্তি হারানো। গুয়াহাটিতে ভোট দিয়ে বেরিয়ে (যেখানে তাঁর ভাড়া বাড়ির ঠিকানা আছে) মনমোহন সিং জানিয়েছেন, দেশে কোনো মোদী ঢেউ তাঁর চোখে পড়েনি। সেই একই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে বাংলার বিপ্লবাচার্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও জানিয়েছেন, তাঁর চোখেও কোনো মোদী উন্মাদনা ধরা পড়ে নি। বিষয়টা শুধু দেখার নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কিছুটা অনুভবের ব্যাপারও থেকে যায়। মনমোহনজীর ক্ষেত্রে দীর্ঘ বন্দিদশার কারণে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি খানিকটা অসাড় হতেই পারে। আবার বুদ্ধবাবুর ক্ষেত্রে ১০০ বছরের বামফ্রন্ট স্বপ্নভঙ্গজনিত জড়তাও থাকতে পারে। সারা দেশের মানুষের নজরে পরিদৃশ্যমান হলেও এমন দু'জন ভি আই পি-র একেবারেই নজরে না পড়া বা মিডিয়ার সৃষ্টি

বলে এড়িয়ে যাওয়া নিশ্চিতভাবেই দৃষ্টিবিভ্রম না হলে অবশ্যই অভিসন্ধিমূলক।

নরেন্দ্র মোদী যেখানেই যাচ্ছেন তিনি সটান বলছেন, তিনি হবু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভোট চাইতে এসেছেন। কিন্তু বুদ্ধবাবু এখনও সেই ১৯৯৬ সালের না কংগ্রেস, না-বিজেপি-র সোনার পাথরবাটী নিয়ে ঘুরছেন। তাঁর দল আগামী কয়েক শতাব্দীতে একক ক্ষমতায় দিল্লী দখল করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন? তিনি জয়ললিতা, মুলায়ম সবার ডি এম কে, লালুর কাছে ফোকটে আসন চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এখন ভাবছেন এঁরা জিতে এলে এঁদের মধ্যে ঢুকে পড়ে লাঠি ঘোরাবেন। আর ক্ষমতার জন্য লালায়িত কংগ্রেস তালে গোলে তাঁদের চাগিয়ে ধরবে। এসব তো বিশ্বনাথ প্রতাপ, দেবেগৌড়া, গুজরাল, চন্দ্রশেখর এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে। তিনি একই স্টেশনে ১৯৯৬ থেকে ২০১৪ প্রায় ২০ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। দেশের কয়েক কোটি টগবগে যুবক যুবতী আজ তাঁর বিজেপি-কে ঠেকানোর মতলবে ক্ষমতার গন্ধ শোঁকায় বিশ্বাস করে না। তারা চায় স্থায়ী কাজ, উচ্চ আয়। ঝকঝকে জীবন আর নিরাপত্তা। যা নেতা হওয়ার সুবাদে অনেকের অযোগ্য ছেলেমেয়েই ভোগ করে আসছে। মোদী সেই সুশাসনের প্রতিশ্রুতিই বিশ্বাসযোগ্যভাবে দিতে পারছেন। যুবসমাজের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বিপুল। মানুষকে হতদরিদ্র করে নিজের আওতায় ধর্মের কোটরে আবদ্ধ রাখতে তাই ক্ষেপে উঠেছে সব সংখ্যালঘু মৌলবাদী দল। গত ২৩ এপ্রিল দিল্লীর জামাত-এ ইসলামী হিন্দ্ কেন্দ্র ধরে ধরে ট্যাকটিকাল ভোটিং-এর ফতোয়া দিয়েছে মুসলমানদের। তা কোথাও এসপি, বিএসপি, আপ, আর জে ডি, টিএমসি, কংগ্রেস, বামদল, জেডিইউ-এর পক্ষে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওদিকে সংখ্যায় খুবই কম হলে কি হয় মুম্বাই সেন্ট জেভিয়ার্স-এর অধ্যক্ষ ফ্রেজার ম্যাসকারানস ছাত্র-ছাত্রীদের মোদীর বিরুদ্ধে যাওয়ার ডাক দিয়েছেন। এঁরাই ধর্মনিরপেক্ষ! ফারুক আবদুল্লার এতদূর হিম্মত যে মোদী সরকার এলে তিনি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার তোপ দেগেছেন। কত ধানে কত চাল না তাঁকে বুঝতে হয়! মোদী প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। সে কথা এখানে নয়।

একটা জিনিস পরিষ্কার। একটি বিশ্বখ্যাত কথা মনে পড়ায় বলছি। সমস্ত পক্ষের এমন মরিয়া আচরণ কেন? রুশ লেখক ডস্টয়ভস্কী বলেছিলেন, what governs men is the tear of truth —নরেন্দ্রভাই মোদী সত্যের পক্ষে। তাই অনেকের কাছে ভীতিপ্রদ। মানুষের বাঁধভাঙ্গা জনপ্রিয়তায় ভর করে রেকর্ড ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তিন বছরের মধ্যেই সারদা-সহ নানান কেলেঙ্কারির সত্যি-মিথ্যেতে জেরবার হয়ে যাচ্ছেন। রঙবেরঙের চিত্রতারকা, গায়ক-নায়ক নিয়ে ভিড় বাড়াচ্ছেন। ১২ বছর একটানা মুখ্যমন্ত্রী থেকে ২০০৪ থেকে আজ অবধি সবরকমের কেন্দ্রীয় আক্রমণের মুখে মোদী অবিচল দাঁড়িয়ে আছেন। কিছু প্রমাণ করা যায়নি। আদবানী একবার বলেছিলেন, একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এমন সর্বাত্মক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিরোধী আক্রমণের দৃষ্টান্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। তিনি আজ প্রমাণিত কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়া, তাই গ্রহণীয়। তারই প্রতিফলন সর্বব্যাপী উন্মাদনায়। অবশ্যই কেউ কেউ দেখতে পাচ্ছেন না। সেই ডস্টয়ভস্কির ভয়। এই ভয়ের বহিঃপ্রকাশ আবার অনেকসময় শালীনতার সব সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। কোথাকার কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেণীবাবু সমাজবাদী থেকে কংগ্রেসী হয়ে আর মাত্র ১৫ দিনের মেহমান দুম করে বলে বসলেন, মোদী একটি জন্তু। ঘোর সাম্প্রদায়িক সমাজবাদী আজমসান বলেছেন, কুত্তে কা বাচ্চাকা বড়ে ভাই। ইত্যাকার বয়ান কি সংসদীয় রাজনীতিতে চলে? ভয়ের প্রতিফলন এত জিঘাংসাময়, কুৎসিৎ হবে কেন? আমজনতা তো ভয় পাচ্ছে না। সব হিসেব নিকেশ উল্টে দিয়ে শ্রীরামপুর স্টেডিয়াম মাঠের ২৭ এপ্রিলের জনসভায় দিদির সভার তিনগুণ ভিড় হয়েছিল। মোদী ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার ছবি কে কিনেছে জনতার কাছে নাম প্রকাশ করতে বলায় তাঁকে 'বুচার অফ গুজরাট' বলে অন্ধ ক্রোধে আক্রমণ করেছে তৃণমূল। হিটলারের নানান কনসেট্রেশন শিবিরের পরিচালকদের এ যাবৎ শিরোপা দেওয়া হোত। প্রতিটি আচরণের মূলে কাজ করছে ভয়। বাজপেয়ীজীকে দিল্লীর দরবারে ৫২ সাল থেকে ক্ষমতাধররা মাপতে পেরেছিল। তিনি ছিলেন দিল্লীকেন্দ্রিক রাজনীতিক। সকলে ছিল নির্ভয়। এই মোদী লোকটা অচেনা আগন্তুক। কিন্তু কংগ্রেস বা বুদ্ধবাবু যারা এই হাত মেলানোর ধোঁকাধারী খেলায় দড় তাদের এমন ছেলে না হতেই অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক করার দরকার নেই। বিজেপি ২০০ আসন ও তার সহযোগীরা যদি আরও ২০/৩০টাও পায় তারা চুপ করে বসে থাকবে? আর বুদ্ধবাবুর কল্পনার ৫০ শতাংশ ভোটধারী সব বিরোধীরা ঝালে-ঝোলে-অম্বলে মিলে অর্থাৎ সিপিএম-টিএমসি, ডিএমকে- এডিএমকে-টিআরএস-ওয়াই এস-আর এস পি-বিএসপি-কংগ্রেসের কার্নিক দেওয়া সরকার গড়বে তা কি হয়? একদিকে ২৪০-২৫০ এমপি-র বট-অশ্বত্থের মহীরূহ অন্যদিকে ১০ বা ২০ জনের গাঁধাল, হেলেঞ্চা, হোগলা গাছের বন তাদের পেছনে ১১০ বা পনেরর পুতুল নাচের কঞ্চি। দেশবাসী এসবে বীতশ্রদ্ধ। এস্বপ্ন ছাড়ুন। আপের সঙ্গে যোগ দিন। দিল্লীতে প্রকাশ কারাত তো ওই দলকেই সমমনস্ক চিহ্নিত করেছেন। ধ্বংসাত্মক আন্দোলন করুন। সাম্যবাদ বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। খুচরো বিনিয়োগ বিরোধী টুকরো-টাকরা আন্দোলন-আন্দোলন মেলে নিরুপদ্রবে বাকি জীবনটা কাটান। দিল্লীর নীতি, দেশের নীতি নির্ধারণে মানুষ আপনাদের চায়ও না। কি দরকার ওসব নিয়ে চুল ছেঁড়ার!

অন্ধ্রের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে ২৫০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা ও গবেষণা করছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় 'রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ' অন্ধ্র প্রদেশের তিরুপতিতে রয়েছে। গত মার্চ মাসে দেশের এই 'ডিমড ইউনিভার্সিটি' দেখার সুযোগ হয়েছিল এই প্রতিবেদকের। পশ্চিমবঙ্গে সরকারের পরিবর্তন হলেও সংস্কৃত ভাষা চর্চার কোনো উন্নতি হয়নি। অথচ সংস্কৃত ভাষাই পারে জ্ঞান প্রযুক্তির যুগে ভারতবর্ষকে সর্বোত্তম শক্তিতে পরিণত করতে। পশ্চিমবাংলাতে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চ ডিগ্রির তেমন সুযোগ সুবিধা না থাকলেও অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে সেই সুযোগ রয়েছে। বাংলার ১৫০ জন ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে সংস্কৃত নিয়ে পড়াশোনা করছেন। যার মধ্যে ৮০ জন বিএড পড়ছেন। দেশের প্রতিটি প্রদেশ থেকে মোট ২৫০০ জন ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যাপীঠে সংস্কৃত ভাষা নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে।

বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদের চর্চা হয়ে থাকে। এই বিদ্যাপীঠে যে সব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন তাদের মাসে ৩৫০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়। ১২৫ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে এটি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষিত হয়। এখানে যেসব কোর্স পড়ানো হয় তা হলো—শাস্ত্রী, প্রাকশাস্ত্রী, আচার্য, সর্বোচ্চ শিক্ষাশাস্ত্রী, শিক্ষা আচার্য (এম এ)। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের মাসিক স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ৪০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত। যতদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করবে ততদিন তাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তিরুমালা মন্দির থেকে বছরে

৫০ লক্ষ টাকা অনুদান আসে এই বিদ্যাপীঠে। থাকা ও খাওয়ার জন্য কোনো টাকা লাগে না। ভর্তির সময় ১০০০ টাকা মাত্র নেওয়া হয়। সারা ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে সংস্কৃত ডিগ্রি নিয়ে নিজেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করছেন। বর্তমানে প্রায় ৫০০ জন বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন যারা নিয়মিত এখানে শাখায় যান। এখানকার বিশাল গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। এছাড়া এখানে সংস্কৃত দিবস, সংস্কৃত কথোপকথন ক্যাম্প-সহ বিভিন্ন শিক্ষার কার্যক্রম হয়ে থাকে।

বিদ্যাপীঠের ক্যাম্পাসের মধ্যেই দেখা হলো মুর্শিদাবাদ জেলার সুকান্ত মণ্ডল, জীবন দাস ও নিত্যানন্দ দাসের সঙ্গে। তারা কেউ সংস্কৃত নিয়ে স্নাতক করছে কেউ বা বিএড করছে। এখানে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির থেকে সংস্কৃত ভাষার অনর্গল কথা বলতে পারা অনিমেষ ত্রিবেদীর সঙ্গে কথা বলে সহজে সংস্কৃতে কথা বলার কৌশল জানতে পারলাম। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষে এই বিদ্যাপীঠ থেকে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার অনুবাদ সংস্কৃতে জনপ্রিয় করার প্রয়াস হয়েছে বলে জানালেন আর একজন ছাত্র বিধান পাণ্ডে। সব মিলিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় বাংলা থেকে প্রতিবছর বেশ কিছু ছাত্র এই বিদ্যাপীঠে আসার প্রবণতা বাড়ছে বলে জানা গেল। সব কিছু ভাল লাগলেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পোষাকের প্রচলন এই বিদ্যাপীঠ অনুপস্থিত দেখে অবাক হতে হয়। নিজ নিজ প্রদেশের পোশাক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকলে শিক্ষার্থীরা আরও ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূলে জীবনকে পরিচালিত করত বলে অনেকে মনে করেন।

এরাজ্যে বাঙালি মুসলমানদের একটা অংশ এবার পদ্মফুলে বোতাম টিপলে অবাক হওয়ার কিছু নেই

গূঢ়পুরুষের

কলম

একটা কথা প্রতিটি নির্বাচনের সময় বলা হয় 'মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক' যে দল হাতাতে পারবে নির্বাচনে সেই দলই জিতবে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক দখলের লড়াই একদা চলতো সিপিএম এবং কংগ্রেসের মধ্যে। মুসলমান ভোট পেতে রাজ্যে তখন ক্ষমতাসীন সিপিএম বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ঢুকে পড়া প্রায় দু' কোটি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড দিয়ে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক দখল করেছিল। সিপিএম নেতারা তখন বড়াই করে বলতেন, 'গ্রাম বাংলার মাটি লাল ঝাণ্ডার দুর্জয় ঘাঁটি'। বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা সেই সময় সাধারণভাবে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে সরকারি জমি দখল করে বাস শুরু করে। পরে তারা ধীরে ধীরে সারা রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতাহীন কংগ্রেসকে মুসলমান সমাজ ত্যাগ করে, কারণ ওই দলের কাছ থেকে কিছুই পাওয়ার আশা তাদের ছিল না। মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে জেলার মুসলমানদের স্বার্থরক্ষাকারী বলে পরিচিত ছিলেন। আজও মুর্শিদাবাদে মুসলমান ভোটাররা কংগ্রেসকে নয়, অধীর চৌধুরীকে ভোট দেয়। শত চেষ্টা করেও অধীর চৌধুরীকে হঠাতে পারেনি সিপিএম। এমনকী, ২০১১-র বিধানসভার নির্বাচনেও মুর্শিদাবাদে অধীর দুর্গ অটুট ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে দু' ধরনের মুসলমান সমাজ আছে। এক, বাংলাভাষী মুসলমান। দুই, উর্দুভাষী মুসলমান। বাংলাভাষী মুসলমানরা ২০১১ সালে লালঝাণ্ডা ফেলে দিয়ে মমতার ঘাসফুলের পতাকা তুলে নেয়। উর্দুভাষী মুসলমানরা কিন্তু তখনও সিপিএমকে ছাড়েনি। সিপিএম ক্ষমতা হারানোর পরেই তারা ঘাসফুলের দলে ঢুকে পড়ে। মমতাও সুযোগ বুঝে হিজাব পরে রমজান মাসে ইফতার পার্টিতে সভা আলো করে বসতে শুরু করে দেন। এই মুসলিম ভোট পেতে তিনি তাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় পদবিটি বিসর্জন দেন। এখন সরকারি ফাইলে তিনি সই করেন পদবিহীন 'মমতা' নামে। মনে রাখতে হবে মমতা বেছে বেছে যে সব ইফতার পার্টিতে যোগ দেন তার প্রায় সবই কলকাতার উর্দুভাষী মুসলমান নেতাদের আমন্ত্রণে। ইসলাম ধর্মে স্পষ্ট বলা আছে যে রমজান মাসে যাঁরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস পালন করেন একমাত্র তাঁরাই ইফতারে যোগ দেবেন। কিন্তু কী করা যাবে। রাজনীতি বড় বালাই! তাই পেট ভরে খেয়ে তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা ইফতারে যোগ দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন। ভোট বড় বালাই! বাংলাভাষী মুসলিমরা ধর্মীয় ব্যাপারে ততটা কট্টর নন, যতটা উর্দুভাষী মুসলমানরা। এই কারণেই উর্দুভাষী মুসলমানরা বাঙালি মুসলমানদের সাচ্চা মুসলমান বলে মনে করে না। অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানরা জানেন না শিয়া-সুন্নী কাজিয়া কেন হয়। ঝগড়াটা কেন?

পশ্চিমবঙ্গে শতাংশের হিসাবে মুসলমান ভোটদাতাদের সঠিক সংখ্যাটি নিয়ে মতভেদ আছে। কারণ, জেলাওয়ারি ভোটের সরকারি পরিসংখ্যান বলছে সংখ্যাটি ২৬ শতাংশ। বেসরকারিভাবে ৩৫ শতাংশ। মনে রাখতে হবে যে মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং দুই দিনাজপুরে মুসলমান ভোটদাতারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্য জেলাগুলিতে নয়। যদি আলোচনার খাতিরে সরকারি গড় সংখ্যা ২৬ শতাংশটি সত্য বলে ধরেনি, তবে তার মাত্র ৬ শতাংশ উর্দুভাষী মুসলমান। এই ৬ শতাংশ মুসলমান ভোটদাতারা দলবদ্ধভাবে ভোট দেয়। বাকি ২০ শতাংশ বাঙালি মুসলমান কলকাতার উর্দুভাষী ইমাম সাহেবদের ফতোয়া মেনে ভোট দেয় না। তাই যে অর্থে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী বা অসমে মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের অঙ্ক কাজ করে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই অঙ্ক খাটে না। আমাদের রাজ্যে বাঙালি মুসলমানদের একটা অংশ এবার পদ্ম ফুলের বোতাম টিপে বিজেপি-কে ভোট দিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সবাই জানে যে মমতা মুখে যত বড় বড় কথাই বলুন না কেন বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বিশেষ কিছুই তিনি করেননি। মমতা দশ হাজার বেসরকারি মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাঙালি মুসলমান পরিবারের ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলেই পড়তে চায়। উর্দু তাদের কাছে অতি দুর্বোধ্য একটি ভাষা। বাংলা ভাষাতেই তারা শিক্ষা পেতে চায়। তাই দশ হাজার পরিকাঠামোহীন মাদ্রাসাকে সরকারি অর্থ বিলিয়ে আখেরে বাঙালি মুসলমান সমাজের কোনও লাভই মমতা করেননি। এটা তাঁর বাঙালি মুসলিমদের এক ধরনের বোকা বানানোর চেষ্টা। ঠিক একই প্রতারণা বাঙালি মুসলমান সমাজের সঙ্গে সিপিএম সাড়ে তিন দশক ধরে করেছিল। বাঙালি মুসলমানদের প্রকৃত উন্নতির পথ হচ্ছে, আধুনিক শিক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া। মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে গড়া যায় না। সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ করে কতজন মুসলমান প্রার্থীকে কাজ দেওয়া যেতে পারে। এগুলি ছেলেভোলানো ললিপপ। যাতে পেট ভরে না। সম্মানও থাকে না। মমতা মুসলমানদের মন জয়ের যে ব্যর্থ চেষ্টা অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছেন তা সবই উর্দুভাষীদের জন্য। বাঙালি মুসলমান সিপিএম জমানায় যেমন বঞ্চিত হয়েছেন, মমতার জমানায় ঠিক একই রকমভাবে প্রতারিত হচ্ছেন। এই সত্যটি বাঙালি মুসলমান সমাজ যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন ততই তাঁদের মঙ্গল হবে। আজ গুজরাটের একটিও মুসলমান পরিবার কোরাণে হাত রেখে বলতে পারবে না যে মোদীর বিজেপি সরকার তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বা কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়নি। তারপরেও নেত্রী বিজেপি-কে সাম্প্রদায়িক দল এবং নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট সরকারকে দাঙ্গাবাজ বলে গলাবাজি করছেন। মোদীকে মুসলমান মন্ত্রে নামাজি টুপি পরে ইফতার পার্টিতে যেতে হয় না। মমতাকে হিজাব পরে যেতে হয়। এরপরেও নেত্রী অসাম্প্রদায়িক!

একটি আগাগোড়া সাম্প্রদায়িক আবেদন

প্রিয় পাঠক,

সাধারণ নির্বাচনের প্রায় শেষ লগ্নে আপনাদের এই চিঠি না লিখলেই নয়। শিরোনামের কথাটা একেবারেই সত্যি। এই চিঠি আদতে একটি সাম্প্রদায়িক আবেদন। এর মধ্যে কোনও ছলচাতুরি নেই। ছদ্ম উদারতাও নেই। সোজা কথা সোজাসুজি বলতে চাই আপনাদের।

স্বস্তিকার পাঠক হিসেবে ধরে নেওয়াই যেতে পারে এই চিঠির পাঠকদের বড় অংশ এই রাজ্যের ভোটার। যখন লিখতে বসেছি তখন রাজ্যের প্রায় অর্ধেক ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ফেলেছেন। তাঁরা মূলত উত্তরবঙ্গের মানুষ। ইতিমধ্যেই তাঁরা যে কাজ করে ফেলেছেন তা করতে দক্ষিণের মানুষের কাছেও আবেদন। সত্যি সত্যিই আপনাদের ভোটকে প্রভাবিত করতেই এই চিঠি লেখা।

গোটা দেশেই এবার যে নির্বাচনী প্রচার হচ্ছে তা দু'টি ভাগে বিভক্ত। একদিকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি-র প্রচার। অন্যদিকে নানা শক্তি। এরাজ্যের কথা মাথায় রাখলে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস শিবির— আলাদা আলাদা করে এই তিন শিবির একে অপরের বিরোধিতা করলেও একটি জায়গায় সকলে এক।

টানা দশ বছর কেন্দ্রে সরকার চালানোর পর ভোটের লড়াইয়ে কংগ্রেসের প্রচারে উন্নয়নের সাফল্যের কথা নেই। মোদী তথা বিজেপি আটকানোর আহ্বান। সেই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন। দ্বিতীয় শিবির তিন বছর আগে রাজ্যে পালাবদল ঘটানো তৃণমূল কংগ্রেস। ঠিক পাঁচ বছর আগে যাঁদের কেন্দ্রের ক্ষমতায় পাঠিয়েছিল মধুচন্দ্রিমা ভেঙে যাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যহীন তোপ। উদ্দেশ্যহীন কারণ, তৃণমূল কংগ্রেস তো বটেই গোটা দেশ এমনকী কংগ্রেসও জানে তারা আর ক্ষমতায় আসছে না। এছাড়াও ঘাসফুলের প্রচারে সংখ্যালঘু উন্নয়নের মিথ্যা প্রচার। এবং নিজেদের সংখ্যালঘুর ত্রাতা হিসেবে প্রমাণ করে বিজেপি তথা মোদীকে ঠেকাতে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন। আর বামেদের 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' ভঙ্গিতে বিজেপি-কে ঠেকাতে ধর্মনিরপেক্ষতার স্লোগান আওড়ানো। অর্থাৎ তিন শিবিরেরই এক এবং অন্যতম দাবি তাঁরাই প্রকৃত সংখ্যালঘু প্রেমী। আর সেটা মানেই তো ধর্মনিরপেক্ষতা।

এক বিজেপি যখন দেশের কর্মসংস্থান বাড়ানো, নারীর সুরক্ষা বাড়ানো, শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন ইত্যাদি ইত্যাদির কথা বলছে তখন বাকি সকলেই নিজেদের সংখ্যালঘু (পড়ুন মুসলমান) প্রেমী প্রমাণে সচেষ্ট। একদিকে দেশের সার্বিক বিকাশ ১২৫ কোটির কথা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে একটি ছোট অংশের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু কেন?

কারণ, তাঁরা সকলেই চাইছেন মুসলিম ভোট পেয়ে জয়ী হতে। কারণ, তারা সকলেই মনে করেন মুসলমান সমাজ শুধু নিজেদের কথাই ভাবে। দেশের কথা নয়। কারণ, তারা জানেন মুসলমানদের 'ভোটব্যাঙ্ক' ভাবতে হয়। কারণ, তারা মনে করেন, হিন্দুর ভোট সবাই কিছু কিছু পায়, কিন্তু মুসলিম ভোটই ঠিক করে দেয় কে জিতবে। কারণ, তারা জানে সাধারণ মুসলমানের উন্নয়ন না করেও সংখ্যালঘু মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করলেই ফতোয়া জারির অস্ত্রে মুসলিম ভোট টানা যায়। কারণ, এরা সকলেই আসলে মুসলমান তোষণের নামে মুসলমান মৌলবাদীদের তোষণ করে।

কিন্তু প্রিয় পাঠক, এই নীতি আর কার্যকর হচ্ছে না। গোটা দেশ এবার উল্টো কথা বলছে। ইতিমধ্যেই এ রাজ্যের যেসব আসনে ভোট গ্রহণ হয়ে গেছে সেখানে উল্টো বার্তাই ইভিএম বন্দি হয়েছে।

প্রিয় পাঠক, আপনিও সেই লড়াইয়ে নামুন। আপনি ভাবছেন আপনার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা নেই। আপনি হয়তো ঠিকই ভাবছেন কিন্তু পরাজিত বিজেপি প্রার্থীর মাধ্যমেও আপনি মেকি ধর্মনিরপেক্ষদের একটা বার্তা দিতে পারেন। মনে রাখবেন বিজেপি জয় না পেলেও আপনার ভোটে পদ্মের প্রাপ্য ভোটের শতাংশ বৃদ্ধি হওয়াই এক বড় বার্তা। বুঝিয়ে দিতে পারবেন মিথ্যে মুসলমান প্রেমের গাজর ঝুলিয়ে আর কাজ হবে না। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ সে বার্তা ভোট মেশিনে দিয়েছে। প্রায় ৬৮ শতাংশ মুসলমান ভোটারের জেলা মুর্শিদাবাদও সে কথা বলছে। এটা নিশ্চিত মনে বিশ্বাস করুন। ১৬ মে সবাই সব জানতে পারবে।

দক্ষিণবঙ্গও বুঝিয়ে দিক রাজ্যে কত শতাংশ মানুষ সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ। কত মানুষ চায় মুসলমানদের ভোটব্যাঙ্ক বানিয়ে রাখা যাবে না। আর বানালেও তা কাজে লাগবে না। আর কোথাও কোথাও কাজে লাগলেও ভবিষ্যতের জন্য সেখানে এক অন্যদিন অপেক্ষা করে আসছে।

প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ প্রার্থীকে জেতাতে না পারুন, তাঁর প্রাপ্য ভোটের শতাংশ বাড়ান। সেটা একটা বড় জয়। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে এ রাজ্যের মানুষের এটা একটা বড় কর্তব্য। শাসকদের বুঝিয়ে দিতে হবে আর মুসলমান ভোটের অঙ্ক নয়, এবার প্রকৃত ধর্মনিরপেতার রসায়নটাও বুঝতে হবে। আর কে বলতে পারে শতাংশ বাড়ানোর লড়াইয়ে সাংসদও তো বেড়ে যেতেই পারে।

— **সুন্দর মৌলিক**

বিচারপতি নিয়োগ

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

ভারতের প্রধান বিচারপতি পি সত্যশিবম (P. Satyasivam) সম্প্রতি অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে প্রস্তাবিত জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিশন (জে এ সি)-এর বিরোধিতা করে বলেছেন, প্রচলিত কলেজিয়াম সিস্টেম-কে আরও স্বচ্ছ ও পরামর্শের ভিত্তিতে (more transparent and the consultation broad-based) করলে সেটাই হবে সব থেকে ভালো ব্যবস্থা।

সংবিধানের ১২০তম সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতি বদলের জন্য ২০১৩-র শেষের দিকে কেন্দ্রীয় সরকার একটা বিল রাজ্যসভায় তুলেছিলেন সেটা ১৩১ : ১ ভোটে গৃহীত হয়েছে। এটা আগেই লোকসভায় গৃহীত হয়েছিল। এবার বিলটা রাজ্যসভাতেও পাশ হওয়ায় উচ্চ আদালতগুলোতে বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতিটা অনেকখানি বদলে গেল।

সংবিধানের ১২৪ (২) নং অনুচ্ছেদে আছে— সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতিই নিযুক্ত করবেন— তবে এই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের কয়েকজনের সঙ্গে তাঁকে পরামর্শ করতে হবে। কোন বিচারপতিদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করবেন সেটা অবশ্য তাঁর ওপরেই নির্ভর করত। আরও বলা হয়েছে— প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁকে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করতেই হবে।

আসল কথা হলো— একটা স্বচ্ছ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা সৃষ্টি করতেই হবে। লর্ড ব্রাইল মন্তব্য করেছেন, 'If the lamp of justice goes out in darkness, how great is that darkness— (মডার্ন ডেমোক্র্যাসিজ, ২য়, খণ্ড, পৃ. ৩৮৪)। তাঁর মতে, বিচারের দীপশিখা নিভে গেলেই নেমে আসে নিঃসীম অন্ধকারের অভিশাপ— গণতন্ত্র তখন ভেঙে পড়ে।

আর ২১৭ (১) নং অনুচ্ছেদে আছে, হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতাও থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে— তবে এই ক্ষেত্রে তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। আরও রয়েছে একটা শর্ত— প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের আগে সেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গেও কথা বলে নিতে হবে।

এটা লক্ষণীয় যে, এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে নিরঙ্কুশ বা একক-ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, কারণ তাতে বিচাপতি-নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রভাব পড়তে পারে। গণপরিষদে অনেক সদস্যই এই ব্যাপারে মতৈক্য দেখিয়েছিলেন— (কন্‌স্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্‌ব্‌লি ডিবেটস্, ৮৪ খণ্ড, পৃ. ২৫৮)। তাঁদের মনে হয়েছিল— রাষ্ট্রপতিকে এই ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিলে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল এই ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করবেন এবং তাতে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিনষ্ট হবে— (ড. বিদ্যাধর মহাজন— দ্য কন্‌স্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২৪২)। সেই জন্য বলা হয়েছে— এই ধরনের নিয়োগের আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে (এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ক্ষেত্রে আরও কয়েকজন বিচারপতির সঙ্গে) পরামর্শ করতেই হবে।

তবে এটা লক্ষণীয় যে, পরামর্শ করার অর্থ সব ক্ষেত্রে পরামর্শটা মেনে নেওয়া নয়। এস এন সিক্রি মন্তব্য করেছেন, রাষ্ট্রপতি এই ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন— 'but he is not bound to accept the advice of the Chief Justies--- (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২০০)। ড. এ. সি. কাপুরও জানিয়েছেন যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে কয়েকজন বিচারপতির সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তো বটেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের সঙ্গে একমত হতে হবে— (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ২৯১)।

তার কারণ হলো— ভাষা ব্যবহারে এক্ষেত্রে কেন সতর্কতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ৭৫ (১) ও ১৬৪ (১) নং অনুচ্ছেদে আছে— যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল ক্যাবিনেট গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে চলবেন— মন্ত্রীদের বেছে নেবেন 'on the advice of the Chief Minister।' এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর উপদেশ মেনে নিতেই হবে। কিন্তু বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে— রাষ্ট্রপতি 'shall consult।' সুতরাং তিনি পরামর্শ করতে বাধ্য, কিন্তু সেই অনুরোধ বা উপদেশ অনুসারে বিচারপতি নিয়োগে বাধ্য নন। সুপ্রিম কোর্টও জানিয়েছে যে, পরামর্শটা হবে বিস্তৃত এবং খোলাখুলি— তবে সেটা রাষ্ট্রপতি মেনে নিতে বাধ্য নন— (ডঃ এস. সি. মাধ্যম--- আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ১৯৮)। তার ফলে

বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ কার্যকরী হয়ে উঠেছিল। হাইকোর্টে নিয়োগের সময় অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর চাপও মেনে নেওয়া হয়েছে বলে ডব্লিউ এইচ. মরিস জোন্স্ মন্তব্য করেছে। তাঁর ভাষায়— 'Chief Justices had given in to the wishes of shate Chief Ministers'— (দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২৪১)। তাছাড়া আমাদের ল-কমিশন মন্তব্য করেছে যে, রাজনীতি অন্যভাবেও এতে এসে পড়েছে— ধর্মীয় ও আঞ্চলিকতার ঝোঁকও অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারটাকে প্রভাবিত করেছে। তার ফলে সব সময় যোগ্যতম ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়া যায়নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বলা দরকার যে, মোটামুটিভাবে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা মান রক্ষা করা হয়েছে। দিল্লী হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রাজিন্দার সাচার মন্তব্য করেছেন— প্রথম দিকেই আমরা সুপ্রিম কোর্টে কৃষ্ণ আয়ার, বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, মেহের চাঁদ মহাজন, কে. সুব্বারাও, এস. এস. সিক্রি প্রমুখকে পেয়েছি— ('অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ অফ জাজেস্, স্টেট্সম্যান, ৩০.৯.১৩)। তার ফলে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলো আমাদের শাসন-ব্যবস্থায় অন্তত দায়িত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরেছে। ড. এম ভি পাইনির ভাষায়— তাদের ভূমিকা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা 'very important role'— (অ্যান্ ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ১৯৭)।

তা সত্ত্বেও ১৯৯৩ সালে এই ব্যাপারে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেই সময় গঠন করা হয়েছে 'কলেজিয়াম সিস্টেম'। কয়েকজন বিচারপতিকে নিয়ে এই 'কলেজিয়াম' গঠিত হয়েছিল— নতুন বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যাপারে এই সংস্থাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত, রাষ্ট্রপতিকে তাঁদের তৈরি 'প্যানেল' থেকেই একজনকে বেছে নিতে হত। বলা বাহুল্য, নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ রোধ করা এবং রাজনীতিকে দূরে রাখাই ছিল এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এবার সেই ব্যবস্থাকেও পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'কলেজিয়াম সিস্টেম'-এর বদলে গঠন করা হবে 'জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ কমিশন— তার কাজ হবে উচ্চ আদালতগুলোতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রভাবিত করা।

আইনমন্ত্রী কপিল সিবাল বলেছেন, আগের ব্যবস্থায় শাসকদের মতের গুরুত্ব থাকত না, বিচারপতিদের প্যানেলই নিয়োগটাকে চূড়ান্ত করত। কিন্তু 'a balance needs to be restored in the appointment of Judges and the excutive must have a say in appointment of Judges।' তিনি আরও জানিয়েছেন, সরকার ১৯৯৩ সালের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চায় না— কিন্তু দরকার একটা 'collaborative exercise'। তাঁর মতে এই পরিবর্তনটা ছিল অত্যন্ত জরুরি, কারণ, 'the present system does not work'।

বিজেপি নেতা অরুণ জেটলী প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বিলটা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানো হোক— কিন্তু সরকার তা মেনে নেয়নি। তার ফলে এই দল ভোটাভুটির সময় 'ওয়াক আউট' করেছিল। সেই কারণে বিলটা সহজেই (১৩১ : ১ ভোটে) গৃহীত হয়েছে।

তবে রাজিন্দার সাচার এই বিলের কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সময়টা ঠিকমতো বেছে নেওয়া হয়নি। লোকসভার নির্বাচন ২০১৪-র মে মাসের মধ্যে হওয়ার কথা। সেই কারণেই বলা যায়— এই শেষ সময়টাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনটা ঠিক হয়নি। দ্বিতীয়ত, হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় মুখ্যমন্ত্রীরও একটা ভূমিকা থাকবে— সেটা অভিপ্রেত নয়। তৃতীয়ত, কমিশনে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের দু'জন জজ, আইনমন্ত্রী, দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি এবং আইনমন্ত্রকের সচিব। কিন্তু 'বিখ্যাত ব্যক্তি' বা 'eminent persons' কারা— সেটা স্পষ্ট নয়। যদি এভাবে দু'জন রাজনৈতিক ব্যক্তি কমিশনে ঢুকে পড়েন, তাহলে বিচারপতি-নিয়োগটা কি সুষ্ঠু হবে? চতুর্থত, বিরোধী-দলের নেতাকেও এটাতে রাখা হয়নি— সেটাও বিলটার বড় ত্রুটি।

এটা করা অত্যন্ত জরুরি যে, উক্ত কমিশনের গঠনের মধ্যেই বিরাট ত্রুটি রয়েছে। আইনমন্ত্রী এবং একজন আমলা এতে থাকবেন, সঙ্গে যদি 'বিখ্যাত ব্যক্তি' হিসেবে দু'জন নেতাও থাকেন, তাহলে নিয়োগের ব্যাপারটাতে চলে আসবে রাজনীতি। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ননী পাল্কিওয়ালা লিখেছেন, 'Experience should teach us that while it is desirable to inject justice into politics, it is disastrous to inject politics to justice'— (আওয়ার কন্স্টিটিউশান, পৃ. ১০১)।

আসল কথা হলো— একটা স্বচ্ছ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা সৃষ্টি করতেই হবে। লর্ড ব্রাইল মন্তব্য করেছেন, 'If the lamp of justice goes out in darkness, how great is that darkness— (মডার্ন ডেমোক্র্যাসিজ, ২য়, খণ্ড, পৃ. ৩৮৪)। তাঁর মতে, বিচারের দীপশিখা নিভে গেলেই নেমে আসে নিঃসীম অন্ধকারের অভিশাপ— গণতন্ত্র তখন ভেঙে পড়ে। এই কারণে হেন্রী সিজউইন লিখেছেন, একটা দেশ রাজনৈতিক উৎকর্ষের কোন্ স্তরে আছে, সেটা বোঝার জন্য জানা দরকার তার বিচারব্যবস্থা কেমন। স্বচ্ছ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থাই রাজনৈতিক জীবনকে সুন্দর করে তোলে— (এলিমেন্টস্ অফ পলিটিক্স, পৃ. ৪৮১)। কিন্তু সেটা চাইলেই মেলে না। হ্যারল্ড ল্যাস্কি মনে করেন, একটা কাম্য বিচারব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রথমেই দরকার সুষ্ঠু নিয়োগ পদ্ধতি— তার লক্ষ্যই হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারক-মণ্ডলীর অবস্থান। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানই তাঁদের মনোনয়ন করুন, কিন্তু সুপারিশ করবেন 'a standing Committee of Judges'— (এ গ্রামার অফ পলিটিক্স, পৃ. ৫৮৪)। কিন্তু আমরা এখনও সেটা মেনে নিই নি।

একান্ত সাক্ষাৎকারে বাবুল সুপ্রিয়

‘বাংলা থেকে যত বেশি বিজেপি সাংসদ যাবেন রাজ্যের বিকাশের ততই সুবিধা হবে’

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র আর বাবুল সুপ্রিয় এই দুটি নাম বারবার রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আলোচনায় উঠে আসছে। শাসকদলের প্রকাশ্য গুণ্ডামি আর প্রশাসনের দলদাসে পরিণত হওয়ার এত কদর্য রূপ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বহুদিন দেখেননি। প্রতিটি সংবাদ মাধ্যম, আইনজ্ঞ মানুষজন, বাংলার সুশীল সমাজ সকলে হতবাক হয়ে গেছেন। বাবুল সুপ্রিয় সারা ভারতবর্ষে একটি অতি পরিচিত নাম। স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী বাবুলের জনপ্রিয়তা সারা দেশ জুড়ে। এরকম একজনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারের সময় বেআইনি অস্ত্র রাখা, জাতীয় সড়ক অবরোধ করার মতো গুরুতর অভিযোগে থানায় এফ আই আর করেছে। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনও আজ্ঞাবহ দলদাসের মতো বাবুল সুপ্রিয়কে থানায় ডেকে পাঠিয়েছে এবং গত ২৩ এপ্রিল আসানসোল কোর্টে জামিন দেওয়ার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু গত ১৩ এপ্রিল রাণীগঞ্জে বাবুল সুপ্রিয়র উপর হামলাকারী তৃণমূল ব্লক সভাপতি সেনাপতি মণ্ডল-সহ অন্যান্য দুষ্কৃতীদের পুলিশ একবারের জন্য থানায় ডেকে পাঠায়নি। এরাজ্যের মানুষ এমন নির্লজ্জ আচরণের দলমত নির্বিশেষে ধিক্কার জানিয়েছে। আদালতও স্বাভাবিকভাবেই সরকারের দাবি না মেনে মাত্র ১৫০০ টাকায় ব্যক্তিগত বন্ডে বিজেপি প্রার্থী ওই শিল্পীর জামিন মঞ্জুর করেছেন।

যে গুণী মানুষটার উপর একের পর এক এমন সব ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে হেনস্থা করছে শাসকদল, যার উপরে শারীরিক আক্রমণ করতেই ছাড়েনি তৃণমূল, তাঁর সঙ্গে একটা দিন কাটিয়ে এলেন স্বস্তিকার

প্রতিনিধি। আসানসোল কোর্ট থেকে বেরিয়ে সোজা প্রচারে। পুরুলিয়া বরাকর রোড ধরে এগিয়ে চলেছে প্রচারের গাড়ী। খবর পেয়ে সংলগ্ন গ্রামগুলো থেকে বেরিয়ে আসছেন দলে দলে গ্রামবাসী। তরুণ, বয়স্ক মানুষ, মহিলা কে নয়। তারাই আগ্রহ করে গ্রামে নিয়ে যাচ্ছেন বাবুল সুপ্রিয়কে। সোদপুর, জসাইডি, বেগুনীয়া, রামনগর একের পর গ্রামে বিপুল উৎসাহ নিয়ে প্রচার গাড়িকে ঘিরে অসম্ভব উন্মাদনা। অনেকেই জেনে গেছেন জামিনের কথা। তাই ছুটে এসে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই। দুপুরে খবর এল চলবলপুরে এক নামকরা তৃণমূল নেতা প্রায় ৫০ জন দলীয় সদস্য নিয়ে যোগ দিতে আসছেন বিজেপি-তে। তাদের আগ্রহ প্রার্থীর হাত থেকেই পদ্মফুলের পতাকা গ্রহণ করবেন তারা।

যেখানেই যাচ্ছেন তাঁর আসার খবরে জড়ো হচ্ছেন শত শত গ্রামবাসী। যুবকদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। বড় রাস্তা থেকে গ্রামে ঢোকার মুখে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ২০-৩০ জন যুবক, মায়েরা শাঁখ বাজাচ্ছেন, আপামর গ্রামবাসী বের হয়ে আসছেন বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে পরিচিত হতে। এই দৃশ্য সর্বত্র।

প্রচারের মাঝে সামান্য একটু বিশ্রাম আর দুপুরের ভোজন। তারপর আবার প্রচার। তাই আলাদা করে বসে নিয়মমাফিক সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ নেই। গাড়িতে যেতে যেতেই স্বস্তিকার প্রতিনিধির সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললেন বাবুল সুপ্রিয়।

□ আজ আদালত আপনাকে সসম্মানে জামিন দিয়ে দিলেন। কিন্তু বিরোধীদের কাছ থেকে এমন অনৈতিক আচরণ কি আপনি আশা করেছিলেন?

□ এখন আর কোনো কিছুতেই আমি অবাক হই না। এইসব মানুষের আচরণের জন্যই তো আজ ‘রাজনীতি’ শব্দটার প্রতিই মানুষের ঘৃণা তৈরি হচ্ছে। আদতে রাজনীতি তো ভাল লোকেরাই করতেন। নেতাজী সুভাষ, মহাত্মা গান্ধী তো রাজনীতি করতেন। কিন্তু আজকের এই ধরনের রাজনীতির নামে নোংরামি হচ্ছে। আমি রাজনীতিতে আসার আগেই কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু

এইরকম অনৈতিক পর্যায়ে বিষয়টা যাবে তা ভাবিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক শীর্ষ নেতানেত্রীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে। তাঁরা আমাকে তাঁদের পরিবারিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেন, তাঁদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমি গান গেয়ে আসি। তাঁরা কি জানেন না এমন ধরনের ভয়ানক সব অভিযোগের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না। তাঁরা কিন্তু একবারও তাঁদের স্থানীয় নেতৃত্বকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেন না।

জনতার মাঝে বাবুল সুপ্রিয়।

▯ আপনি একজন খ্যাতনামা শিল্পী, খ্যাতির শিখর থেকে আপনি রাজনীতির ময়দানে নামলেন কেন?

▯ এটা আমার ভেতরের তাগিদ বলতে পারেন। সমাজের জন্য, মানুষের জন্য কিছু করব, এমন ভাবলেই আমার দুজনের কথা মনে হোত। এক অটলবিহারী বাজপেয়ী আর অন্যজন নরেন্দ্র মোদী। অটলজীর সরকার ছিল আমার মতে স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে যোগ্য সরকার, সুশাসনের সময়। আর গানের অনুষ্ঠানে আমাকে বছরে বেশ কয়েকবার গুজরাটে যেতেই হয়, তাই আমি দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে কী দ্রুত সেখানে উন্নতি হয়েছে। যে মডেল নরেন্দ্র মোদী ভারতের জন্য করতে চান তা তিনি গুজরাটে নিজে করে দেখিয়েছেন।

আর সর্বভারতীয়ভাবে তো শুধু দুটোই দল। তার মধ্যে কংগ্রেসের ওই পরিবারতন্ত্র আমার একেবারে পছন্দ হয় না। যেমন প্রণব মুখার্জী এত যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করতে পারল না। আজও কপিল সিব্বলদের মতো বর্ষীয়ান, অভিজ্ঞ নেতা থাকার পরেও রাহুল গান্ধীকেই সামনে রাখতে হচ্ছে। রাহুল ভবিষ্যতে কি হবেন সেটা তো আগামী দিনই বলবে, তবে বর্তমানে তাঁর যোগ্যতা ওই জায়গার জন্য একেবারেই যথেষ্ট নয়। তাই যখন আমার কাছে বিজেপি-র পক্ষ থেকে প্রস্তাবটা এল, তখন আমি ৫/৬ দিন সময় নিয়েছিলাম। আর আমি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যা দেখেছি কিন্তু বিখ্যাত শিল্পীদের বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করেছি, তাতে ববভিলানই হোন বা বব মালে, শিল্পীর একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। এই ভাবনাই আমাকে বিজেপির মাধ্যমে দেশের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই গান গাওয়া আর মানুষের জন্য কাজ করা এদুটো একেবারে বিপরীত প্রান্তের বিষয় নয়।

▯ তৃণমূল কংগ্রেসের জীতেন্দ্র তেওয়ারী আপনার বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগের মূল পরিকল্পনাকার। শোনা যাচ্ছে আজ সকালে তো আপনি তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছেন?

▯ (হেসে) : আমি সবসময়েই লড়াইকে মাঠের মধ্যে রাখতেই ভালবাসি। আজ যখন কোর্ট থেকে ফিরছিলাম, আমাদের বিজেপি-র এক সহকর্মী ভাই আমাকে চিনিয়ে দিলেন তেওয়ারীজীকে। ব্যাস, আমি গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে নমস্কার করলাম। কুশল বিনিময়ের পর চা খাওয়ারও অনুরোধ

করলাম। রাজনীতির বিরোধিতাটা ঠিক কতদূর পর্যন্ত পর্যন্ত নেওয়া উচিত তারও তো একটা উদাহরণ থাকা দরকার!

□ এবারের নির্বাচনে আসানসোলে তৃণমূল এরকমভাবে কোনো ন্যায় নীতির পরোয়া না করে আপনার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেন?

একনজরে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র

আসানসোলের ৭টি বিধানসভা— (১) পাণ্ডবেশ্বর, (২) রানীগঞ্জ, (৩) জামুরিয়া, (৪) আসানসোল দক্ষিণ, (৫) আসানসোল উত্তর, (৬) কুলটি, (৭) বারাবনি। মোট ভোটার— ১৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৬৪ জন। বুথ কেন্দ্র ১৮১৩টি।

বর্তমানের সাংসদ সিপিএম-এর বংশগোপাল চৌধুরি, ২০০৯-এ ভোট পেয়েছিলেন মোট প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৭১.৪৯ শতাংশ।

বাবুল সুপ্রিয়-র বিপরীতে রয়েছেন তৃণমূলের দোলা সেন, সিপিআই (এম)-এর বংশগোপাল চৌধুরি, কংগ্রেসের ইন্দ্রাণী মিশ্র, গরিব আদমি পার্টির মহম্মদ মুস্তাকিম।

২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় সাতটি বিধানসভার মধ্যে চারটিতে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। তিনটিতে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট। ২০১১-এর পাঁচটি বিধানসভা পায় তৃণমূল জোট, দু'টি বামফ্রন্ট।

□ সঠিক কারণটা তো ওনারাই বলতে পারবেন। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহল, মিডিয়া, সাধারণ মানুষ সকলের বিশ্লেষণেই এবার অনেক এগিয়ে বিজেপি। তৃণমূল হয়তো বুঝে গিয়েছে এবার তাদের জেতার সুযোগ প্রায় নেই। এই পরাজয় যত বেশি নিশ্চিত হচ্ছে, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব তত বেশি হিংস্র হয়ে উঠছে। জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন অনুভব করে। ওরা এখন মাঠের মধ্যে না খেলে মাঠের বাইরে খেলতে চাইছে। কিন্তু মানুষ আজ অনেক সচেতন, ওদের কারসাজি সহজেই ধরা পড়ে যাচ্ছে।

□ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে আপনি ভোটারদের কাছে কি বার্তা দিতে চান।

□ একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই, নোংরামির উত্তরে আমি কখনো নোংরামি করব না, করতেও বলব না। আপনারা রাজনৈতিকভাবে এর উত্তর দিন।

(একটু থেমে) যেমন আমার বিরুদ্ধে বলার জন্য ওরা টলিউড থেকে অনেককে নিয়ে আসছেন। অনেকে বাধ্য হয়ে আসছেন, তারপর রাতে ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করে বলছেন, "তোমাকে এত ভালভাবে চিনি তোমার বিরুদ্ধে কি বলব?" এর উত্তরে আমি কি করতে পারি। এটা তো প্রোগ্রাম অরগানাইজ করার কাজ নয় যে ওরা টলিউডকে এনে দেখাচ্ছেন বলে আমি বলিউডকে নিয়ে আসব! লড়াইটা রাজনৈতিক। আমি সম্ভব হলে মোদীজীকে আনার চেষ্টা করব বা রাজনাথজীকে আনব, যাঁদের থেকে সঠিক পথনির্দেশ পাওয়া যাবে। আসল কথাটা হলো, ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা শুনিয়েছে, রাজ্যের কোনো উন্নতি করেনি। তৃণমূলও একই কান্না শুরু করেছে। এবার কেন্দ্রের বঞ্চনার বদলে কেন্দ্রের বন্ধুত্বের রূপটা একবার দেখি না! কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসছে আজ এটা নিশ্চিত। তাই যত বেশি সংখ্যক বিজেপি সাংসদ বাংলা থেকে যাবেন, রাজ্যের বিকাশের জন্য তত সুবিধা হবে।

□ কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এলে আসানসোলের জন্য আপনার কি ভাবনা।

□ দেখুন অজুহাত দিতেই আমরা সবচেয়ে পটু। আজ আমি কিছু প্রতিশ্রুতি দেব তারপর পাঁচ বছর ধরে শুধু অজুহাত দিয়ে যাব সেটা আমি আদৌ চাই না। প্রকৃতির নিয়মেই আমি চলি। আমার দুটো কান আর একটা মুখ। একটা মুখে কিছু বলার আগে দুটো কান দিয়ে শোনাটা বেশি জরুরি বলে মনে হয়। তাই এলাকার মানুষের দুঃখের কথা, চাহিদার কথা আমি মন দিয়ে শুনছি। আর মনে মনে এক এক করে গুরুত্ব অনুসারে সাজাচ্ছি।

□ যদি একটু বুঝিয়ে বলেন...?

□ যেমন সবচেয়ে প্রথম হল জল। এই সমস্যার সমাধানে আমি সারা দেশের অভিজ্ঞ সংস্থা, প্রযুক্তিবিদের কাছে যাব। আমি আসানসোলের সঙ্গে দিল্লীর একটা সেতুর মতো কাজ করব। যাতে সার্বিক সংস্থা, সঠিক প্রযুক্তি দিয়ে কাজ করতে পারে আর তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও যাতে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করব। মানে সেটা আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবে।

□ জল ছাড়া আর কি সমস্যা আপনাকে ভাবিয়েছে?

□ এছাড়াও অনেক সমস্যা আছে। বন্ধ কলকারখানা। কোথাও শিল্প হয় না। এখানে শিল্প হয়ে বন্ধ হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় পরিত্যক্ত নগরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা সারি দিয়ে বন্ধ কারখানা। রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভীষণ খারাপ। ততোধিক খারপ অবস্থা চিকিৎসা

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

ব্যবস্থার। আর আসানসোলকে জেলার মর্যাদা দেওয়ার দাবিও অনেক পুরোনো। একটা ছোট কাজ করতেও বর্ধমানে যেতে হয়। এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন অনেক বিষয় যদি যুক্তির সঙ্গে সমাধানের দিকে এগোনো যায় তবে ৫ বছর অনেক সময়। সদিচ্ছা থাকলে ভালো কিছু অবশ্যই করা যাবে। শুধুমাত্র 'বিউটিফিকেশন' বা উপর উপর সৌন্দর্যায়ন না করে সমস্যাগুলোর গভীরে ঢুকে সমাধান প্রয়োজন।

□ মানুষের কাছ থেকে কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

□ সাড়াটা খুব 'ফেনোমেনন' বলেই তো ওদের রাতের ঘুম চলে গেছে। মানুষের ভালোবাসা আমি এতটাই পাচ্ছি, তাই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক তরজার গিয়ে সেই ভালোবাসাটা আমি নষ্ট হতে দিতে চাই না।

□ জেতার ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী?

□ মাঠে যখন নেমেছি তখন জেতার জন্যই নেমেছি। মনের সেই জোরটা যতদিন যাচ্ছে ততই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। গানের মধ্যে দিয়ে যেমন আমি আসলে মানুষকেই খুশি করি, এখানেও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশা আমাকে একইভাবে মেটাতে হবে। আমার কাছে দুটো বিষয়ের বিশেষ ফারাক নেই। আমি বিশ্বাস করি শুধু মুখে বললে হয় না করে দেখাতে হবে। আমি গান জানি এটা বললেই কি লোক খুশি হবে? আমাকে গেয়ে শোনাতে হবে, তবেই না! শুধু পার্থক্য হলো মঞ্চে অনুরোধগুলো ভিন্ন ওখানে কেউ 'পেয়ারী মন' 'কহো না প্যার হ্যায়' কিংবা কেউ 'ফনা' শুনতে চায়, এখানে হয়তো কেউ বলবেন জল চাই। ওভারব্রিজ করে দিতে হবে এইসব। তবে গানের মতো এখানেও করে দেখাতে হবে। শুধু দিতে পারি বললেই হবে না। নেচার অফ ওয়ার্কটা চেঞ্জ করে যাবে। কিন্তু দ্য জব, অ্যাজ আ হোল, অ্যাজ আ কমিটমেন্ট উইল রিমেন দ্য সেম।

□ আজ আপনার অনুভূতিটা কেমন? একটা বিরোধী পক্ষ হেরে যাচ্ছে। তারা সবরকম অসাধু উপায় অবলম্বন করেও শেষ রক্ষা করতে পারছে না। সারা দেশের মানুষ তাদের ধিক্কার দিচ্ছে। প্রশাসনের ভূমিকা দেখে হাসছে। এখন কোন বিশেষ কথা, বিশেষ গান কি আপনার মনে আসছে?

□ আজ কোর্ট থেকে বের হওয়ার পর থেকে পাওলো কোয়েলহোর-এর সেই লাইনটা বারবার মনে হচ্ছে। হোয়েন ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট সামথিং, অল দ্য ইউনিভারস কন্‌সপায়ারস ইন হেল্পিং ইউ টু অ্যাচিভ ইট। আজ আমার বিরুদ্ধে অন্যায়টা সম্পর্কে সব জায়গায় মানুষ যখন কথা বলছেন, তখন আমার কেন যেন মনে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি আমাকে সাহায্য করার জন্য অধীর হয়ে আছেন। আর গানের মাধ্যমে যদি বলতে হয় তো হ্যালো ব্রাদারে সলমান খানের জন্য যেটা গেয়েছিলাম সেটাই মনে হচ্ছে 'হটা সাওন কি ঘটা'। যতই ষড়যন্ত্র হোক, আকাশ মেঘে কালো হয়ে আসুক, সব কিছু মিলিয়ে গিয়ে ওই দেখুন ঝলমলে সূর্য বেরিয়ে আসছে।

নেত্রদান মহাদান

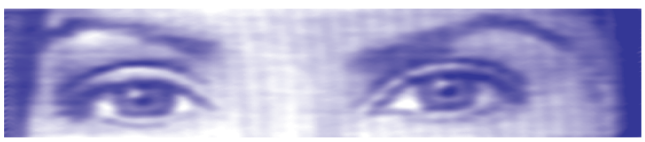

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

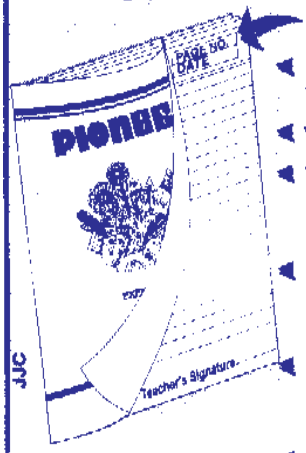

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0566
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

Sharada Travels

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ সূচী ২০১৪

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
কাশ্মীর	জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী	১৩	১৭ই মে	১৪,৫০০/-
দার্জিলিং	টাইগার হিল, ঘুম মনেস্ট্রী, বাতাসী, মিরিক	৬	৩০শে মে	৬,০০০/-
সিমলা	সিমলা, কুফরি, মানালী, রোটাংপাস, কুলু, মনিকরন	১১	১৮ই মে	১১,২০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার-হৃষিকেশ, লক্ষ্মনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	২৭শে মে	৬,২০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ,ডিনার (আমিষ/নিরামিষ),টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া,ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে,হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✷ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✷ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✷ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

চিঠিপত্র

রক্ষা কবচ

ভারত বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহত্তর রাষ্ট্র। এই দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার অন্যান্য দেশের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়। বর্তমান ভারতবর্ষে প্রায় একশ একুশ কোটির কাছাকাছি জনসংখ্যা। তারা তাদের পছন্দসই রাজনৈতিক দলকে নির্বাচিত করে দিল্লীর সিংহাসনে বসায়। ঘটনা হলো, সিংহাসনে বসে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলটি তাদের পূর্বপ্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যায়। এটা কি কাম্য? আর এই ব্যাপারে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো--- কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এই কংগ্রেসই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি বছর ক্ষমতায় আসীন ছিল। বর্তমানে টানা দশ বছর। কিন্তু কি উপকার করেছে তারা দেশ তথা দেশের মানুষের? কিছু করুক বা না করুক একটা কাজ যে তারা ভালোভাবে করছে সেটা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারছে আপামর ভারতবাসী। তা হলো দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, মূল্যবৃদ্ধি, সংখ্যালঘু তোষণ ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই কোমায় চলে যাওয়া ইউপিএ সরকারের আর দরকার নেই এটা সাধারণ মানুষ বেশ বুঝেছে এবং তার ইঙ্গিতও দিয়েছে প্রাক্ নির্বাচনী সমীক্ষায়। বর্তমানে কংগ্রেস তথা ইউপিএ সরকারের ভালো মানুষের মুখোশটা খুলে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এক দানবের চেহারা। এবার মানুষ চায় তাঁকে— যে দেবে একটা সুস্থ সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সুশিক্ষা, নির্ভরতা আর অনাবিল শান্তি এবং সে হয়ে উঠবে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রক্ষাকবচ। তাঁর আগমন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

—নরেশ মল্লিক,
জামালপুর, বর্ধমান।

আর এস এস নিয়ে রাহুল গান্ধীর বালখিল্য মন্তব্য

মহাত্মা গান্ধীকে আর এস এসের লোকেরা মেরেছিল। সারা ভারত জাতীয় কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধীর উপরি-উক্ত মন্তব্যকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে জোর বিতর্ক। মহারাষ্ট্রের থানেতে এক নির্বাচনী সভায় রাহুল এমন বিতর্কিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করায় আর এস এস স্বভাবতই তার প্রতিবাদ করেছে। এমনকী তারা রাহুলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে এবং আইনি পদক্ষেপও নিয়েছে।

অবশ্য গান্ধী-হত্যা নিয়ে বহু পূর্বেই আদালত আর এস এস-কে নির্দোষ বলেই রায় দিয়েছে। তাছাড়া গান্ধী-হত্যাকারী নাথুরাম গডসে গান্ধী-হত্যার সঙ্গে আর এস এস যুক্ত বা আর এস এসের নির্দেশে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছেন— এমন কোনো স্বীকারোক্তি তিনি কোথাও কখনও করেননি। এ ব্যাপারে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই। তাই আদালত সঙ্ঘের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে সঙ্ঘকে দিয়েছে গ্লানি থেকে মুক্তি। অথচ রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ, ইতিহাসে অজ্ঞ তথা নবীশ রাহুল রাজনৈতিক বিদ্বেষবশত, ক্ষমতা হারানোর ভয়ে এবং হতাশাক্রান্ত হয়ে সঙ্ঘের গায়ে গান্ধী হত্যার কলঙ্ক লেপনে হয়েছেন সচেষ্ট। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আর কাকে বলে?

তবে শুধু রাহুল গান্ধীই বা একা কেন, তাঁর পূর্বসূরিদের অনেকেই রাজনৈতিক, সামাজিক বা জাতীয় সঙ্কটে পড়লেই, নিজেদের মুসলমানপ্রেমী সেকুলারবাদী প্রমাণ করতে বিজেপি-আর এস এসের মুণ্ডুপাতে ব্রতী হয়েছেন, আর এস এসের বিরুদ্ধে গান্ধী-হত্যার কাসুন্দি ঘেঁটেছেন, যে প্রয়াস আজও অব্যাহত। অবশ্য প্রায় ছয় দশক ভারত শাসনকালে দুর্নীতি-কেলেঙ্কারির চোরাবালিতে ডুবতে ডুবতে আজ কংগ্রেস আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জনতার ছোঁড়া ঘৃণার তিরে সর্বাঙ্গ তার ক্ষত-বিক্ষত। এদিকে ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনও সমাসন্ন। এমতাবস্থায়, কংগ্রেস তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়েই যাচ্ছে। সেই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই দিচ্ছে না আর এস এসকেও। ১২৮ বছরের প্রাচীন কংগ্রেসের কান্ডারি তথা 'সুপ্রিমো' সোনিয়া মাইনো গান্ধী, যিনি ইতালিয় বংশোদ্ভূত, একদা নরেন্দ্র মোদীকে বলেছেন, 'মৃত্যুর সওদাগর'। এক নির্বাচনী জনসভায় সম্প্রতি বলেছেন, 'বিষের চাষা'। তাঁরই এক অনুগত সেবক মণিশঙ্কর আইয়ার কিছুদিন আগে মোদীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, এক চা বিক্রেতা ছিলেন। বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী একজন স্বয়ংসেবক। দীর্ঘদিন ছিলেন সঙ্ঘের প্রচারক। পরবর্তীকালে এসেছেন রাজনীতিতে। গুজরাতের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী। যেহেতু মোদী একজন স্বয়ংসেবক এবং সঙ্ঘের সঙ্গে রয়েছে যোগাযোগ, সেহেতু কংগ্রেস 'যুবরাজ' গান্ধী-হত্যার দায় সঙ্ঘের ঘাড়ে চাপিয়ে জনসমক্ষে মোদীকে হেয় করতে চাইছেন। রাজনৈতিক যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে রাহুল এখন মোদী বধে গান্ধী-হত্যাকে করছেন অস্ত্র। কিন্তু সেই অস্ত্র কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে ভোঁতা। গান্ধী-হত্যাকারী নাথুরাম গডসের সঙ্গে যে আর এস এসের কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং সেই হত্যাকাণ্ডে আর এস এসের কোনো হাতও ছিল না তা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। 'চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না' যেমন, তেমনি সত্যকেও মিথ্যে দিয়ে ঢাকা যায় না। রাহুল গান্ধীর বালখিল্যতার মাশুল শীঘ্রই গুণতে হবে শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেসকে। যেমন গুণতে হয়েছে ইতিপূর্বেও।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

অস্তিত্ব সঙ্কটে হিন্দু বাঙালি

ডাঃ দুলালকৃষ্ণ দাস

বিভিন্ন অশনি সংকেতের পদধ্বনিতে প্রশ্নটা দিনদিন আরো প্রকট হচ্ছে। কেউ কেউ এটাকে হতাশাব্যঞ্জক কল্পনা মনে করলেও বিষয়টি বোধহয় ভেবে দেখার সময় এসেছে। তার প্রধান কারণ এখন হিন্দু বাঙালিরা আর বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠী নয়। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এখন একটি ক্ষয়িষ্ণু জনসমষ্টিতে পরিণত হয়েছে। আর অবক্ষয়ের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

দেশভাগের মূলশর্ত ছিল— যেসব জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা বেশি, সেগুলিকে পাকিস্তানকে দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে সেই শর্ত কতটা পূরণ হয়েছে তা ঐতিহাসিকরা বিচার করবেন। তবে আমরা জানি খুলনা, যশোরের মতো হিন্দুপ্রধান জেলা পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরনের বৈষম্যের মানে একটাই; আর তা হলো বাঙালি জাতিকে নির্জীব এবং নিষ্ক্রিয় করে রাখা, যাতে করে বাঙালি জাতি আর কেনোদিন উঠে দাঁড়াতে না পারে, ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশের সুযোগ না পায়। এছাড়া আর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানেও দেখা গেছে তখনকার রাষ্ট্রনায়করা হিন্দু বাঙালিদের চেয়ে মুসলিমদের প্রতি বেশি দাক্ষিণ্য দেখাতে চেয়েছিলেন।

নেতাজী কোথায় আমরা জানি না। জানতেও দেওয়া হলো না। সেও এক রহস্যময় ষড়যন্ত্র। সে রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি। তাঁর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনে যারা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা সেটাকে আরো রহস্যময় করে তুলেছিলেন। মাতৃশক্তি পত্রিকায় গত শারদীয় সংখ্যায় শ্রী পিনাকী ভাদুড়ী বলেছেন, তাঁকে সর্বশেষ রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় বন্দিদশায় দেখা গিয়েছিল। হয়তো সেখানকার হিমশীতল কুঠরীতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেই বিপুল সম্পত্তি কোথায় গেল তাও আমরা জানতে পারলাম না। নেতাজীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্কট শুরু হয়েছিল।

আমাদের নেতাজীকে হারিয়েছি। মাতৃভূমি খণ্ডিত করেছি। মাতৃভাষাও বোধহয় হারাতে বসেছি। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বাংলাভাষা বাঁচাতে উর্দুভাষার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল। শহিদ হয়েছিল। তাদের মূল লড়াই ছিল উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে। এ বাংলায় এখন তার উলট পুরাণ। ২১ ফেব্রুয়ারি আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করি আর এমন সব কাজ করি যাতে করে বাংলা ভাষার অবলুপ্তি ঘটে। যেমন গত আর্থিক বছরে হিন্দিভাষার উন্নয়নে বাজেট ছিল ৫৯ কোটি টাকা, আর উর্দুভাষার জন্য ২৫ কোটি টাকা। বাংলাভাষার জন্য কোনো বাজেট ছিল না।

আগে দূরদর্শনে বাংলা খবরের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত এবং উর্দুতে খবর প্রচারিত হোত। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সংস্কৃত খবরটি বন্ধ হয়ে গেছে। উর্দু খবর এখনও চলছে। নানা অজুহাতে সংস্কৃত টোলগুলি অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। তাতে ধর্মনিরপেক্ষতা কতটা রক্ষিত হচ্ছে জানি না, তবে পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাকে অন্তর্জলি যাত্রায় পাঠানো হয়েছে। বাঙালি জাতির ইতিহাস খুঁজতে গেলে সংস্কৃত ভাষায় ঢুকতেই হবে। আর সেই ভাষা যদি লোপ পায় বাঙালির ইতিহাসও একদিন মুছে যাবে। জাতিটাও হারিয়ে যাবে।

স্বাধীনতার আর একটি পূর্বশর্ত ছিল বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা এসেছিল তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। তারা লাগোয়া রাজ্যে একলপ্তে পুনর্বাসন পেয়ে গেল। কিন্তু পূর্বপাকিস্তান থেকে যারা এলো তাদের ভাগ্যে জুটল মরিচঝাঁপির গণহত্যা। তার পরেও যারা বেঁচে রইলো তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। মাতৃভাষা হারিয়ে তারা এখন কেউ কর্নাটক, কেউ মালায়ালি, কেউ হিন্দুস্তানি অথবা আন্দামানের অধিবাসী। অনেক রাজ্য তাদের এখনও নাগরিকত্ব দেয়নি।

যাঁরা সেই দুর্বিপাক থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পেরেছিলেন তাঁরাও আজ মাতৃভাষা ভুলতে বসেছেন। কেননা তাঁরা তাদের উত্তরসূরিদের আর বাংলা স্কুলে পড়াতে চাইছেন না। তাঁরা তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে চান বিলেতি সংস্কৃতিধন্য ইংলিশ মিডিয়ামে। কারণ বাংলা পড়ে আর রুটিরুজি মিলছে না।

একটি স্থিতিশীল জনসংখ্যা সেই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম শর্ত। হিন্দুবাঙালির জনসংখ্যাও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সচেতন নবদম্পতিরা আর একটির বেশি সন্তান নিচ্ছেন না। বিলম্বিত বিয়ের কারণে মেয়েদের বন্ধ্যাত্বের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। দেরিতে মা হওয়ায় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম বেড়ে গেছে। ফলে পরিবার পিছু নবীনের সংখ্যা শূন্য থেকে দুইয়ের মধ্যেই আটকে গেছে। পক্ষান্তরে মুসলিমদের মধ্যে সেই সংখ্যাটা চার থেকে পাঁচ। তাদের এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা আজও অব্যাহত। এখনও পরিবার কল্যাণের জাতীয় কর্মসূচির বিরোধিতা করে নিজ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বাড়াতে তাদের উৎসাহিত করা হয়।

ফলে আগামী একপ্রজন্মেই আমাদের জনসমষ্টি অর্ধেকে গিয়ে দাঁড়াবে। এমন ধারা চলতে থাকলে হয়তো বা এমন একদিন আসবে যখন আর আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন দেখা যাচ্ছে যে বাড়ির কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা করার মতো লোক পাওয়া যায় না। আয়া সেন্টার থেকে লোক ভাড়া করতে হয়।

মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমি হারিয়ে বাঙালি কোন্ পরিচয়ে বেঁচে থাকবে বোঝা কষ্ট। যদি কোনো অবলম্বন অবশিষ্ট থাকেও, তা গ্রাস করে নিচ্ছে সামাজিক অবক্ষয়। আমরা এখন যতটা উৎসবমুখী ততটা আন্দোলনমুখী নই। তাই নিজের অস্তিত্ব রক্ষাতেও আমরা আর সংগ্রামী হতে রাজি নই। বরং আনন্দের আতিশয্যে গা ভাসিয়ে দেওয়াই এখন সহজ এবং লাভজনক। সুস্থ স্বকীয়তা নিয়ে বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ প্রতিষ্ঠাতেও আমাদের অনীহা। সেখানেও আমরা ক্রমবর্ধমান আত্মকেন্দ্রিকতার শিকার। আত্মসুখেই আমরা পরম তৃপ্ত।

রবীন্দ্র পদ্যকাব্যে উপনিষদের প্রভাব

ড. সীতানাথ গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথ যে পারিবারিক ঐতিহ্যে লালিত হয়েছিলেন তাতে উপনিষদের ভাবধারা ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান ছিল। কর্মকাণ্ডের নিঃসারতা ও জ্ঞানকাণ্ডের সারবত্তা প্রদর্শন করে অখণ্ড এক আত্মার অন্বেষণই ছিল ব্রাহ্মসমাজের মূল ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য। সেই পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠা রবীন্দ্রমানস ঔপনিষদিক ভাবধারায় বিশেষ প্রভাবিত হবে তাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু কেবলমাত্র তারই ফলে রবীন্দ্রকাব্যের ঔপনিষদিকতা সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এ কথা বললে অন্যায় হবে। ভাবপ্রবণ কবি মন সসীম আনন্দে যখন পরিতৃপ্ত হতে পারল না তখন অন্বেষণ চলতে থাকল অসীমের আনন্দসমুদ্রের। সাধনা ব্যতিরেকে সেই আনন্দসাগরে, সেই জ্যোতির সমুদ্রে স্নান সম্ভব নয়, তাই কবিকে তার জন্য বহু বৎসর ধরে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছিল।

প্রথম জীবনের কাব্যগুলিতে 'জীবননাথ'-এর উদ্দেশে তিনি বহু আকুতি প্রদর্শন করেছেন, পরমসত্তা লাভের ব্যাকুলতায় তাঁর কাব্যগুলি ছিল ভরপুর। কিন্তু অনুভূতির সে গভীরতা তেমন পাওয়া যায় না যেমনটি পাই তাঁর শেষ পর্বের কাব্যগুলিতে। 'চিত্রা'র অন্তর্গত 'জীবনদেবতা' কবিতায় কবি তাঁর আকুলতা প্রকাশ করে বলেছেন—

দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।
আপনি করিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ
আমার রজনী, আমার প্রভাত—
আমার মর্ম, আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে।
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা
আনো নব রূপ আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে।

সংকীর্ণতা, কলহকালিমা, নীচতা, বর্বরতার সঙ্গে যুদ্ধ করাতে কবির যথেষ্ট শক্তি ব্যয়িত হয়েছিল। এই সংঘর্ষের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাকুলতা এমন এক প্রচণ্ডতার স্তরে উঠেছিল যে কবি স্থির থাকতে পারেননি, সত্য-শিব-সুন্দর পরমেশ্বরের উপলব্ধির জন্য উন্মত্ত প্রায় কবি ঝড়ের মধ্য দিয়ে চেয়েছিলেন এ সকল অবাঞ্ছিতের বিনাশ। তাই দেখি 'কল্পনা' কাব্যের বর্ষশেষ কবিতায় বলে উঠেছেন রবি কবি—

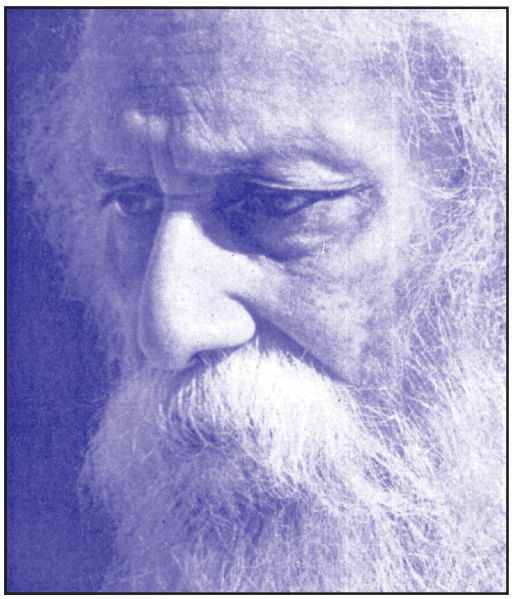

সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।
যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।

'নৈবেদ্য' কাব্যে দেখি কবির মধ্যে যেন সহসা এক আলোকদীপ্তি ও আনন্দস্ফুরণের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি নিজেই তাতে চমৎকৃত। তখন প্রাণস্পন্দন 'অপরূপ ছন্দে তালে তালে নাচিছে ভুবনে।' তিনি বিস্ময়ে বলছেন— 'ওগো বিশ্বভূপ, দেহে মনে প্রাণে আমি এক অপরূপ'। এই ক্ষণেকের স্ফুরণে কবির তৃপ্তি নেই। তিনি জীবনব্যাপী আনন্দ কামনা করেন—

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার ভবনদ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর-সৎ কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভচেষ্টাকেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে।
আবার—
বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশ আপনারে রাখিবারে স্থির।।

এই নৈবেদ্য কাব্যে তিনি উপনিষদের বাণীকেই গ্রহণ করে বললেন—

একদা এ ভারতের কোন বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ কি আনন্দ বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে শোন বিশ্বজন

শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী। আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার অন্য পথ নাহি।

এই পংক্তিগুলি যেন শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের আক্ষরিক অনুবাদ। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের কবি প্রত্যক্ষ করলেন—

শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থু।। (২।৫)

আরও—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুর্মেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।। (৩।৮)

'গীতাঞ্জলি' কাব্যে কবির সেই ব্যাকুলতা, প্রার্থনা আরও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি অনুভবও করেছেন সেই স্বপ্রকাশ সত্যকে, কিন্তু কেন যেন তাঁর তৃপ্তি নেই। সর্বত্র অনুভব করতে চান তাঁকে কিন্তু তিনি যেন একটু দেখা দিয়েই চলে যান। এই লুকোচুরি, চাওয়া-পাওয়া আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়েই তাঁর অনুভূতির প্রতিষ্ঠা চলেছে। কবি বলছেন— 'সমুখ দিয়ে স্বপনসম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে' (১৮)। 'আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছলবে না। আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না'। (২৩)। 'প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে, দেখা নাই পাই পথ চাই, সেও মনে ভালো লাগে'। (২৮) আবার দেখি—

'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে
সবহারাদের মাঝে। (১০৭)

কবি সর্বত্র আনন্দের হিল্লোল অনুভব করে বলছেন—

আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।
যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে,
ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অট্টহেসে।
যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখিজলে
দুঃখব্যথার রক্তশতদলে,
যা আছে সব ধুলায় ফেলে দিয়ে
যে আনন্দ বচন নাহি ফুরে—
যে আনন্দ মেলে তাহার সুরে। (১৩৪)

অনুভূতির আনন্দে প্লাবিত কবি গেয়ে চলেছেন—

এই জ্যোতিঃ সমুদ্রমাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই। (১৪২)

উপনিষদিক চিন্তাধারায় পুষ্ট রবীন্দ্রমানস সুস্পষ্ট আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর শেষ জীবনের কাব্যগুলিতে। প্রেমশক্তি কবিহৃদয় যেন আনন্দ পারাবারে তন্ময় হয়ে আছে; ব্যাকুলতা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আছে কেবল নিঃসীম আনন্দানুভূতি। তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, কোনো দ্রব্যবিশেষে তা সীমায়িত নয়। শুশ্রূষাকারিণী নারীর হস্তে তিনি অনুভব করেন— 'দূরকাল হতে তারি হস্ত দুটি লয়ে সেবারস আতপ্ত ললাট মোর আজো ধীরে করিছে পরশ'। (রোগ শয্যায়, ৩৩)। একটি গোপাল ফুলের মধ্যেও তিনি অনুভব করেছেন 'জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ'। (রোগশয্যায় ২১)। তাঁর ভাবপ্রবণ আনন্দোচ্ছল মন এর মধ্য দিয়েই উপনিষদের তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেছিল—

যুগযুগান্তের আবর্তনে
সৌন্দর্যের পরিণামে যে শক্তি তোমারে আনিয়াছে
অপূর্ণের কুৎসিতের প্রতি পদে পীড়ন এড়ায়ে,
সে কি অন্ধ, সে কি অন্যমনা,
সেই কি বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো
সুন্দরে ও অসুন্দরে ভেদ নাহি করে—
শুধু জ্ঞানক্রিয়া, শুধু বল ক্রিয়া তার,
বোধের নাহিকো কোন কাজ?

পাঠক এই সঙ্গে শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের ৬।৮ মন্ত্রটি লক্ষ্য করবেন—

পরাস্য শ বৈধ প্রয়তে
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চ।

কবি যে সমস্ত বিশ্বকে তার অখণ্ডরূপে দেখেন তা তিনি এই প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন—

আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এবিশ্বকে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন।

একটি কুকুরের সংস্পর্শে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়—

বাক্যহীন প্রাণীলোক মাঝে
এই জীব শুধু
ভালোমন্দ সব ভেদ করি
দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে;
দেখেছে আনন্দে যারে প্রাণ দেওয়া যায়,
যারে ঢেলে দেওয়া যার অহেতুক প্রেম,
অসীম চৈতন্যলোকে
পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা। (আরোগ্য ১৪)

প্রকৃতির সব কিছুর সঙ্গেই যে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত আছে তা তিনি বলেছেন 'জন্মদিনে' কাব্যের ঐক্যতান নামে কবিতায়—

প্রকৃতির ঐক্যতান স্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে;

তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ—
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ।

'প্রান্তিক' কাব্যে কবি যেন তাঁর অনুভূতির উপযুক্ত ভাষা আর খুঁজে পেলেন না। তাউ উপনিষদের শব্দগুলি নিয়েই বললেন—

হে পুরণ্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

ঈশোপনিষদের যে মন্ত্রটি তাঁর অবলম্বন তা হ'ল—

পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মান্ সমুহতেজঃ। যন্তে রূপং কল্যাণ-তমং তত্ত্বে পশ্যামি। যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।। (ঈশ, ১৬)

ঈশোপনিষদের অপর যে, দুটি মন্ত্র তাঁর বহু কবিতার উপজীব্য হয়েছে সেগুলি—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যসাবিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।। (১৫)
বায়ুরনিলামৃতমখেদং ভস্মান্তং শরীরম্।'।। (১৭)

কবি লিখেছেন—

হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ করো অনাবৃত
সেই দিব্য আবির্ভাবে হেরি আমি আপন-আত্মারে
মৃত্যুর অতীত। (জন্মদিনে, ১৩)
আবার, তমসের পরপার
যেথা মহা অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।
আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।
যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু
ভস্মে যার দেহ অস্য হবে...., (জন্মদিনে, ১৩)
আরও,
সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ
মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।
মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার...। (আরোগ্য ৩)

যে আনন্দ অমৃতের কথা মুণ্ডক উপনিষদে (২।৮) 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাবি' রয়েছে তারই অনুকৃতি পাই রবীন্দ্রের বহু কাব্যে, যেমন—

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে/ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল। আনন্দ—অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ। (রোগশয্যায়, ২৫)

এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে আনন্দ-অমৃতরূপে— (রোগশয্যায়, ২৮)

জানায়েছ অমৃতের আমি অধিকারী;
পরম আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে। (আরোগ্য, ৩২)
এ আমার আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকিরিত (আরোগ্য, ৩৩)

'রোগ শয্যা' কাব্যের—

দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও,
পরাভূত রজনীর অপমান-সহ। (১০)

কবিতাটি মুণ্ডক উপনিষদের ২।১০ মন্ত্রের সহিত তুলনীয়।

যে প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব জানুসুকুতাতি সর্বং
তস্য ভাস্য সর্বমিদা ভাতি।।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।১৪) মুণ্ডকে (২।১১) ও কঠে (২।২।১৫) রয়েছে তারই অনুরণন। রয়েছে 'রোগশয্যায়' কাব্যের নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে—

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদবুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে ধাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে। (২০)

উপনিষদের কেবল চিন্তাধারা নয়, উপনিষদে উদ্ধৃত সংস্কৃত শব্দগুলি পর্যন্ত গ্রহণ করেও যখন কবি তৃপ্ত হতে পারেননি তখন আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। তাতেও যখন সেই নিষ্কলুষ অনুভূতি প্রকাশের পথে বাধা হবে বলে কবি মনে করলেন তখন বাংলা কবিতাতে উপনিষদের সংস্কৃত পঙ্‌ক্তি অবিকল উদ্ধৃত করলেন তাঁর 'রোগশয্যায়' কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতায়—

তখন বুঝিতে পারি ঋষির বাণী—
আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।
কো হেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ
তদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। (তৈত্তিরীয় উপনিষদম ৭)

ছোটদের উদ্যোগ

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব আর পানু

কৌশিক গুহ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের জন্যে একমাস আগে থেকে তৈরি হয় অরূপরা। ওদের দলে অনেকে আছে। ছোটোরা বড়োরা মিলিয়ে পঁচিশজন তো হবেই। কি কি হবে ঠিক হয়ে গেলো একটা মিটিং করতেই। আসলে সকলকে আগে থেকে ভেবে আসতে বলা হয়। মিটিং-এ হাজির হয়ে ভাবনা নয়। স্কুলের হোম টাস্ক করার মতো হোমওয়ার্ক করার ব্যাপার থাকে। তাহলে আলোচনা কখনও এলোমেলো হয়ে যায় না। কবে অনুষ্ঠান, কখন, কি কি হবে, কারা অংশ নেবে— প্রথমে এটা ঠিক হলো। তারপর কত খরচ হতে পারে সেটাও মোটামুটি জানা গেলো। খরচ সামলানো যাবে কীভাবে তা নিয়েও কথাবার্তা হলো। দায়িত্ব কার কি থাকবে তাও ঠিক করে নিতে বেশি সময় লাগল না। শম্পা অনেকটা দায়িত্ব নিলো। তাপসও। খরচের দিকটা নিয়ে ভাবল মোহিত নিশীথ সুজিত।

নিরঞ্জনকাকুর উপর সবদিক সামলানোর ভার দিলো অন্যান্য বছরের মতো। সব দিক নজর রেখে কাজ করা অভ্যেস বরাবর। ডাক নাম পানু। পোশাকি নামের থেকে পানু নামটাই পরিচিত। রাজনীতির লোক নয়। পেশায় ডাক্তার এবং উদ্যোগী মানুষ। বাড়ির প্রত্যেকের জন্যে যথেষ্ট করেছে। আশপাশের সকলের জন্যেও। লোকের বিপদে আপদে সবার আগে ছুটে গেছে। সাইকেল চালিয়ে ঘোরে নানা দিকে। কেউ কেউ বলে, 'একটা মোটরবাইক কিনে নাও না পানুদা।' পানুর জবাব, 'এত বছর সাইকেলে সবকিছু করলাম। আজ মোটরবাইক কি হবে! গতির থেকে দুর্গতি বাড়বে।' 'পানুকাকু' বলে ছোটোরা। বলল, 'আমি তোদের রিহার্সাল দেখতে পারবো না। রোজ রিপোর্টটা নিয়ে নেবো। অনুষ্ঠানের আগের দিন আর অনুষ্ঠানের দিন থাকবো।' অনুষ্ঠানের আগের দিন অনেক কাজ। শেষ মুহূর্তে লক্ষ্য রাখতে হয় সব ঠিকঠাক হলো কিনা।

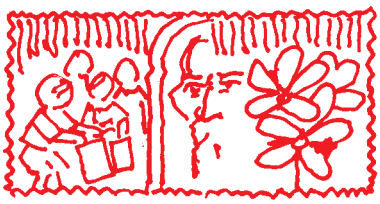

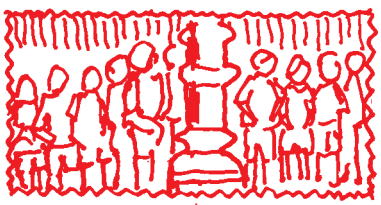

প্রতি বছরের মতো এবারেও পানুকাকুর বাড়ি থেকে এলো রবীন্দ্রনাথের ছবি। বিরাট সাদা কালো ফোটোগ্রাফ থেকে বাঁধানো। শম্ভু সাহার তোলা। ছবিটা জোগাড় করেছিল একজনের কাছ থেকে। তারপর জানবাজারে মল্লিকদের দোকানে বাঁধিয়ে এনেছিল। একবার ছোটোরা অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ছবিটা ভেঙে ফেলেছিল। পানু কিছু বলেনি। শুধু জিগগেস করেছিল, 'কারও হাতটাত কাটেনি তো কাঁচে?' ছবিটার কোনো ক্ষতি হয়নি। নতুন করে বাঁধাতে দিয়েছিল পরের দিন গিয়ে। এখন সেটাই রয়েছে। একবার কোনোরকম অসতর্কতায় ভেঙে যাওয়ার পর প্রতিবার সাবধানে ছবিটি আনে আর দিয়ে আসে নভোদীপরা। ছবি ফুল দিয়ে সাজাবার দায়িত্ব তাদের। ছবির উপর চন্দন লাগানো হয় না। কোনো কৃত্রিম ফুল নয়, টাটকা জুঁই আর রজনীগন্ধা। ফুলের খরচ দেয় পানু। সব মিলে একেবারে ঝকঝকে ব্যাপার। ছোটোরা নাচ গান নাটকে আবৃত্তিতে অংশ নেবে। পানুদার তত্ত্বাবধানে জোরদার রিহার্সাল হলো। পোশাক কার কি হবে ঠিক হয়েছিল আগেই। মঞ্চসজ্জা আর সাজসজ্জার দিকটা দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিলো তাপস আর শান্তনু।

পানু একটুও চেঁচামিচি করে না। শান্ত স্বভাবের মানুষ। একটা কথা দুবার বলে না। ছোটোদের সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব। প্রতিদিন রিহার্সালের সময় লজেন্স পাঠিয়ে দিয়েছে। অনুষ্ঠানের আগের দিন কলেজস্ট্রিট বইপাড়ার বিশ্বভারতীর দোকান থেকে কিনেছিল অনেক টাকার বই।

অনুষ্ঠান শেষে সেগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করার ভার পড়ল সমিত আর মালার উপর। খাওয়ার দিকটা পানু সামলাচ্ছিল। সে ওই দায়িত্বটা পুরোপুরি নিয়েছিল বলে নয়, তার জানা আছে কীভাবে সবদিক সামলাতে হয়। অরূপ একটা কাজ করেছিল পানুকাকাকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমি আবৃত্তি করিয়েছিল। কোনো রিহার্সাল নয়। পানুর আবৃত্তি ছোটোরা বড়োরা মন দিয়ে শুনেছিল। সবাই জানত, পানুকাকা মামুলি উদ্যোগী মানুষ। সজ্জন। কিন্তু সে যে ওইরকম আবৃত্তি করতে পারে, এটা অরূপের আবিষ্কার বলা যায়। শম্পার ছেলে টুবলাই একটা কার্ড তৈরি করেছিল রবীন্দ্রনাথের ছবি দিয়ে। তাতে লেখা 'ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান।' 'পানুমামা' বলে টুবলাই।

পানু কার্ড পেয়ে আনন্দে জড়িয়ে ধরল ভাগ্নেকে।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

প্রতিদিন বই দিন, ছোটোদের বই দিন

অমিতের পড়ার ঘরে লেখা আছে : ‘প্রতিদিন বই দিন, ছোটোদের বই দিন।/ বই দিন প্রতিদিন, বড়োরাও বই নিন।’ বই নিয়ে মাতামাতি নয়। শুধু মনে করিয়ে দেওয়া সকলকে রোজই কিছু-না-কিছু পড়তে হবে। শুধু পড়া নয়, তা মনে রাখা দরকার। নতুন বই মানেই দারুণ মজা। পুরোটা পড়া হোক বা না হোক উল্টেপাল্টে দেখে নিতে হয়। দেরি করতে মন চায় না। কেউ কেউ বলে, ‘এখন বাড়িতে ছোট ছোট জায়গা’ ভালোভাবে শোয়া বসা যায় না। বই থাকবে কোথায়?’ এই যুক্তিটা মানতে চায় না অমিত। প্রত্যেক বাড়িতে কিছু বই দিব্যি রাখা যায়। সেজন্যে চাই তাগিদ। বইয়ের প্রয়োজন আছে এটা বোঝা। বইকে ভালোবাসা চাই তারপর। নিয়মিত পড়ার অভ্যেস গড়ে তোলা চাই। একটু বেছে বই কিনলে তা তো সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে যাবে। অমিত ছোটোদের বন্ধু। তারা খুব সহজভাবে অনেক কথা বলতে পারে। ছোটোরা বই চায় সবসময়— এটা সে জানে। ছোটো থেকে যদি বইকে ভালোবাসতে শেখে তাহলে বইয়ের টান থেকে যাবে সারাজীবন। দিনে দিনে বাড়বে।

মাঝে মাঝেই অমিত ছোটোদের নিয়ে মেতে ওঠে। কদিন আগে আঁকা আর লেখার আসরের ব্যবস্থা করেছিল লাইব্রেরির মধ্যে। প্রতিযোগিতা নয়। অংশগ্রহণই মূল কথা। অভিভাবকরা চান প্রতিযোগিতা। অনেক ছেলেমেয়ে ছবি মুখস্থ করে এসে আঁকে। ওইভাবে তারা শেখে বা শেখানো হয়। প্রাইজ পেতে হবে— এটাই বড়ো হয়ে ওঠে। সকলে মিলে ছবি আঁকার আসরে যোগ দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে তা বুঝতে চায় না। আসলে ছোটো থেকে ওইভাবে শেখানো হয়নি। ছোটোরা নিজের মতো করে ভাবুক— এটাই বার বার মনে করিয়ে দেওয়া। আগে থেকে কোনও বিষয় বলা নেই। ছোটোরা আঁকা আর লেখার আসরে এসেছে। তারা তৈরি হয়ে রয়েছে। ঘণ্টা বাজলেই আঁকা শুরু হয়ে যাবে। অমিত বলল, ‘যে যা খুশি আঁকো।’ বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ে শুরু করে দিল আঁকা। যারা মুখস্থ করে আঁকতে অভ্যস্ত তারা সেরকম কিছু করার কথা ভাবল। যারা ভাবনার স্বাধীনতা চায় তারা রঙ নিয়ে শুরু করে দিল অন্যরকম খেলা। বেশ জমে উঠল আঁকার আসর।

আঁকার পরে প্রত্যেককে দেওয়া হলো খাবার আর একটা করে বই। কেউ কেউ জিগগেস করলেন, ‘কখন জানানো হবে প্রতিযোগিতার ফলাফল।’ অমিত বলল, ‘প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা ছোটোদের সৃজনীসত্তাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যে।’ ছোটোদের বলা হলো, ‘বিকেলে সকলের ছবি টাঙানো হবে। দেখতে এসো।’

বইমিত্র

এই গরমে সদানন্দ

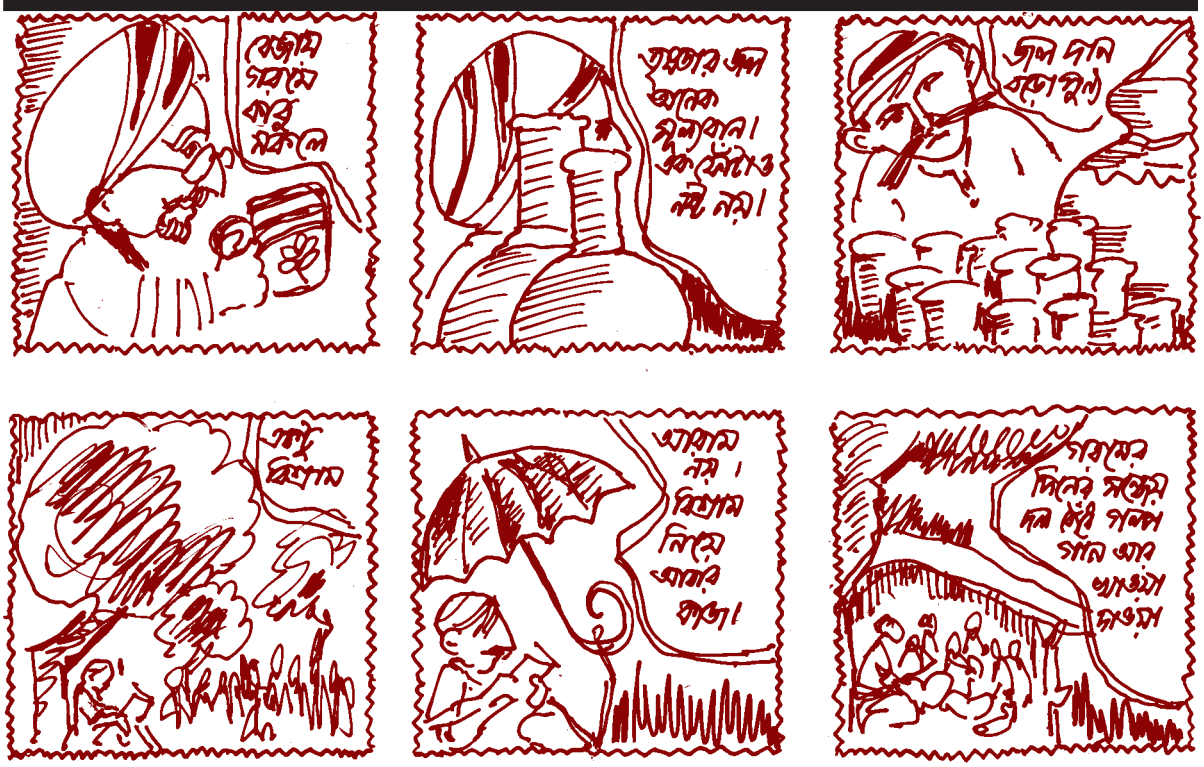

নারী লাঞ্ছনায় প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা

শুভশ্রী দাস

নয়া দিল্লীতে ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাতে ২৩ বছর বয়সী ছাত্রীর ওপর যে মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটেছিল, তার প্রতিবাদে সমাজে সার্বজনিক ক্রোধ প্রকাশ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল। কিন্তু তারপরেও মুম্বাই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর ও আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত, কামদুনি-সহ অনেক স্থানে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে। এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সংবাদমাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়—এক অসহায় মেয়ের ওপর এত জঘন্য অত্যাচার করার কল্পনা ওই নাবালক কোথা থেকে পায়? এরকম বীভৎস কাজ করতে ওই নরপশুরা কেন প্রবৃত্ত হয়?

আমাদের দেশে মহিলা ও শিশুকন্যার ওপর যৌন অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চলেছে। এজন্য আমাদের এই প্রশ্নের গভীরে গিয়ে তার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানে অনেকবার এ বিষয়ে চর্চা হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের ওপর যৌন অত্যাচারে পিছনে একটি প্রধান কারণ যে বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা নারীশরীরকে উপভোগের বস্তু হিসাবে দেখানো হচ্ছে যে বিষয়ে খুব একটা আলোচনা হচ্ছে না। বিশেষ করে এ বিষয়ের ওপর ভালোভাবে কোনো আলোচনা দেখা যায়নি। শুধু দোষারোপ করা নয়, আমি শুধু সর্বত্রগামী, সহজভাবে ব্যবহার ও সহজভাবে যৌনাচারের দৃশ্যগুলি দেখানো মাধ্যমগুলি সম্পর্কে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছি। মাধ্যমগুলির মধ্যে সমাচারপত্র, বিভিন্ন ম্যাগাজিন, টিভি, এফ এম রেডিও, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, ধারাবাহিক, মিউজিক ভিডিও, সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইটস্, ইন্টারনেট, ইউ টিউব সবই আছে। পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছে যাওয়া এই লোকমাধ্যম খুব প্রভাবী ও শক্তিশালী মাধ্যম। লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, শহর বা গ্রামের ভেদ, জাতি, ধর্ম, বংশ, দেশ, সমাজ, গরিব-ধনী —এই সবই মর্যাদাকে লঙ্ঘন করতে পারে এই প্রচারমাধ্যম। এটা সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। ইন্টারনেট তো তিন বছরের শিশুও ব্যবহার করতে পারে। এরকম সহজলভ্য ও অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যমকে আমরা যদি মহিলাদের ওপর অত্যাচারের জন্য দায়ী না করি তাহলে এই মাধ্যমগুলি মানবজাতির জন্য বিপদরূপে দাঁড়াতে পারে।

মনে করা যাক, যখন প্রশাসন কোনো জনজাগরণের কার্যক্রম শুরু বা সর্বসাধারণ ব্যক্তির কাছে কোনো সূচনা পৌঁছতে হবে, তখন সমাজের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি লোকমাধ্যমকে ব্যবহার করে। তারজন্য কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হয়। কেননা বিখ্যাত ব্যক্তি বা অভিনেতা সমস্তলোকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এর দ্বারা যদি ভালো প্রভাব বিস্তার করা যায় তো খারাপটাও হতে পারে— এটা আমরা কেন বুঝতে পারি না?

সিনেমায় সলমন খান যখন কোনো মেয়েকে টিজ করে তখন হাজার যুবক তার অনুকরণ করে। যখন অক্ষয়কুমার কোনো মেয়ের শরীরের পার্শ্বভাগে চিমটি কাটে তখন কোনো ছেলের তা দেখতে খারাপ লাগে না— আমরা একথা কেন ভুলে যাই? কারণ নায়ক যখন এটা করছে তখন তা খারাপ হতে পারে না। যখন নায়িকা আইটেম ডান্স করে তখন তা খুব সাধারণ কথা। কিন্তু যখন তার বিকৃত অঙ্গভঙ্গি ও অশালীন পোশাক অন্যভাব জাগায়। 'চিকনী চামেলী', 'শীলা কী জওয়ানী', 'ম্যাঁয় তন্দুরী মুর্গী হুঁ' অথবা 'গটক লে মুঝে অ্যালকোহল সে' গানের সঙ্গে নর্তকী কটরিনা কাইফ এবং 'লৌড়িয়া পটায়েঙ্গে মিসড্ কল সে' নাচ-গানে নায়ক দর্শকের ওপর সম্ভাব্য পরিণামের বিষয়ে খুবই প্রভাব বিস্তার করে। কেবল শব্দ-ই নয়, নায়ক-নায়িকার পোশাক ও অশ্লীল হাবভাবও পরিণামকারী হয়। মজার কথা হলো, 'চিকনী চামেলী' নাচগান দেখে মেয়েদেরও খারাপ লাগে না, তখন পুরুষরা তাদের দিকে উপভোগের দৃষ্টিতে দেখে। এই সব নাচগানের হাবভাব ও গানের শব্দ মহিলাদের ওপর যৌন অত্যাচারের প্রকাশ্য অনুমোদন জানায়। অনেকেই দেখে থাকবেন জিস্ম-২ ও রাজ-৩ সিনেমার পোস্টার। সবসময় লোকজন ওঠাবসা করেন এমন রাস্তায় মহিলাদের নগ্ন শরীর-সহ চোখ বুজে রাখতে হবে এরকম বিজ্ঞাপন যত্রতত্র শোভা পাচ্ছে। ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর বোম্বে টাইমস্ পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা চিত্র (বর্ণনা করা যাবে না) দেখে কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। এ সবই মনকে পীড়া দেওয়ার মতো ঘটনা। সিনেমা হোক, বিজ্ঞাপন হোক, ধারবাহিক হোক বা খবরের কাগজের ছবি হোক সবই মহিলাদের শরীর দেখিয়ে মাধ্যমগুলি বাজার বাড়াতে ব্যস্ত।

প্রচারমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব নয়— একথা প্রশাসনের থেকে আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। খারাপ ভাব জাগানো সিনেমা ও পোস্টার নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব নয়। এরজন্য রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। মহিলাদের ওপর হওয়া অত্যাচার ও মনোরঞ্জনের স্তরের পতন হওয়া দেখে সমাজের জাগ্রত হওয়া খুবই প্রয়োজন। গুজরাট এ বিষয়ে অনেকটা এগিয়ে আছে।

মহিলাদের ওপর অত্যাচার বাড়ার পিছনে মাধ্যমগুলিই একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু অনেক কারণের মধ্যে এটি একটি বড় কারণ। মহিলাদের সম্মান রাখতে আমরা যে যে কথা ও যে যে স্তরে লাগাম টানতে পারি সেই সবই বিষয়কে আটকানো প্রয়োজন। সুস্থ ও সুরক্ষিত সমাজে এটাই মহিলাদের অধিকার। আর তা আমাদের অবশ্যই পেতে হবে।

একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি নিয়ে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে লড়াই চালাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন দক্ষ প্রশাসক

আর. কে. হাণ্ডা

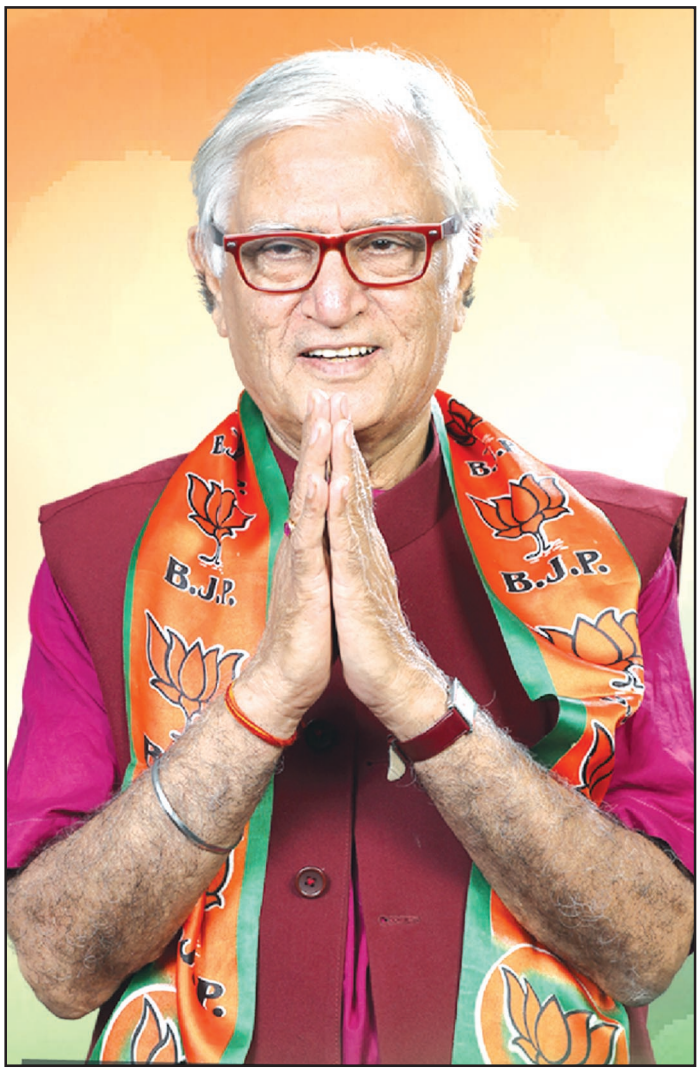

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে এদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার রক্ষক হিসাবে সরকারি কাজে যোগাদান করেন। এরপর একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে থাকেন তিনি। কিন্তু কোনো অংশেই তাঁকে পিছপা হতে দেখা যায়নি। অত্যন্ত সৎ, সাহসী এই পুলিশ অফিসার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে পেরিয়ে এসেছেন একের পর এক বাধা-বিপত্তি। আর এবার এক বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চলেছেন এই মানুষটি— ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডঃ আর. কে. হাণ্ডা। যে পরীক্ষায় তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ দীনেশ ত্রিবেদী, সিপিআই(এম) প্রার্থী সুভাষিনী আলি এবং কংগ্রেস প্রার্থী সম্রাট তোপাদারদের। তবে আমডাঙ্গা, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া এবং ব্যারাকপুর— এই সাতটি বিধানসভার মানুষ সর্বোচ্চ নম্বর দিয়ে শ্রীহাণ্ডাকে কতটা এগিয়ে রাখেন সেটা সময় বলবে, কিন্তু তার আগে এই সাতটি বিধানসভার যা চিত্র তাতে স্পষ্ট উঠে এসেছে মানুষ আর আবেগে ভাসতে চায় না। বিচারবুদ্ধি এবং বিবেককে সম্বল করে আনতে চায় আর এক পরিবর্তন। যাতে দশ এবং দেশের লাভ হয়। তাই দলে দলে মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেছে প্রাক্তন দক্ষ প্রশাসকের প্রচার অভিযানে।

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এইরকম ব্যতিক্রমী এক ব্যক্তিত্ব যাঁর কর্মের উদ্দেশ্য ছিল দুষ্কৃতীর দমন এবং এক সুন্দর সুস্থ সামাজিক পরিমণ্ডল তৈরি, তাঁর নাম আর. কে. হাণ্ডা। তিনি তাঁর স্নাতকোত্তর শিক্ষা শেষ করেন মনস্তত্ত্ব বিভাগে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে। তিনি ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস সরকারি কার্যে যোগদান করেন ১৯৬০ সালে। এর পূর্বে তিনি শিক্ষকতা করেন এক কলেজে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে গবেষণামূলক কার্যে যুক্ত ছিলেন।

সরকারি কার্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল পশ্চিমবঙ্গ। তাঁর কর্মজীবন যথেষ্ট ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যময় ছিল। ১৯৮৪ সালে তখনকার ডেপুটি কমিশনার (পোর্ট) হিসাবে নিয়োজিত হন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে প্রচণ্ড দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৮৬ সালে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (GNlF)-এর আন্দোলন উত্তরবঙ্গের শান্তিভঙ্গ করে শান্ত

ফঃ ৪

নিজের কেন্দ্র ঘুরে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন শ্রী হাণ্ডা।

পাহাড়কে উত্তাল করে তোলে। সেই সময় আরো একবার তাঁর দক্ষতার পরিচয় মেলে 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ' হিসাবে নিয়োজিত হয়ে। তবুও তিনি অত্যন্ত সহমর্মিতার সঙ্গে এই সংকট সমাধান করেন এবং 'দার্জিলিং অ্যাকার্ড' এর সহমতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। বদলে পান দেশবাসীর আন্তরিক প্রশংসা ও ভালবাসা।

এরপর তিনি ফিরে আসেন কলকাতায় জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ হিসাবে। কলকাতার যানজট সমস্যার এক অভূতপূর্ব সমাধান করেন ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা শুরু করে।

বিশেষ দক্ষতামূলক কার্যের স্বীকৃতি তিনি অর্জন করেন 'Indian Police Medal For Meritorious Service' এবং 'Presidents Police Medal'। একতামঞ্চ থেকে তাঁকে 'ইনসানিয়ত' পদকে ভূষিত করা হয়। তিনি ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেন 'Calcutta Traffic Thesis'-এর উপর। তিনি পুলিশ সার্ভিসের সর্বোচ্চ পদ থেকে ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (সিকিম) হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর অবসর জীবন শুরু হয় আর এক কর্মব্যস্ত ক্ষেত্রে যেখানে তাঁর স্বপ্ন— তাঁরই মতো আরো শতেক কর্মক্ষম সার্থক নাগরিক তৈরি করা।

এই ভাবেই চলছে তাঁর নিরলস, অক্লান্ত মানব সেবা। এবার এক নতুন দিগন্তে তাঁর পদার্পণ...

একনজরে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র

মোট ভোটার— ১২ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৩৭ জন।

বুথের সংখ্যা—১৫৩৩।

এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র—

১। আমডাঙ্গা, ২। বীজপুর, ৩। নৈহাটি, ৪। ভাটপাড়া, ৫। জগদ্দল, ৬। নোয়াপাড়া, ৭। ব্যারাকপুর।

এই কেন্দ্রে এবারের নির্বাচন প্রার্থী—

১। আর কে হাণ্ডা—বিজেপি।

২০০৯-এ বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৩.৫৬ শতাংশ।

২। দীনেশ ত্রিবেদী—তৃণমূল।

২০০৯-এর প্রাপ্ত ভোট ৪৯.২৮ শতাংশ (কংগ্রেস- তৃণমূল জোট)।

৩। সুভাষিনী আলি—সিপিএম।

২০০৯-এ সি পি এমের প্রাপ্ত ভোট ৪২.৮৪ শতাংশ।

৪। সম্রাট তোপাদার—কংগ্রেস।

আমূল ও হিমূল : মোদী বনাম মমতা সরকার

বাসুদেব পাল

প্রায় মাসখানেক আগে জনৈক প্রাবন্ধিক একটি পত্রিকায় লিখেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল— 'হিমূল' কেন আমূল হতে পারল না।'' জবাবটা হয়ত উনিও জানেন— বাংলায় রয়েছেন বাম এবং মমতা-রা আর গুজরাটে আছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এবং এম ভার্গিস ক্যুরিয়েন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর গত বৎসর ২৯ সেপ্টেম্বর দেশের রাজধানী নতুন দিল্লীতে প্রথম বড় জনসভা করেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ''লন্ডন, কলকাতা, মুম্বাই— যেখানেই চা-পান করবেন, গুজরাটের আমূল দুধ থাকবেই।'' এর মধ্যে একটুও অতিরঞ্জিত করা হয়নি। গুজরাটের 'আমূল দুগ্ধ সমবায় প্রকল্প' বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ সমবায় প্রকল্প। এটাই ঘটনা, অবশ্যই 'দুধ-মানুষ' বিশেষণে ভূষিত ভার্গিস ক্যুরিয়েন-এর অবদানও মহত্ত্বপূর্ণ। অথচ বাম ও ডান উভয় রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক দুগ্ধ প্রকল্পের নাভিশ্বাস উঠেছে অথবা অকালে অন্তর্জলি যাত্রা ঘটেছে।

১৯৪৬ সালে গুজরাটের খেড়া জেলায় প্রথম সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প শুরু হয়। বর্তমানে সেই সংখ্যাটা ১,৫৫,৬৩৪টি। গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশনের মাথার মণিই হলো 'আমূল'। 'আমূল'-ই আমূলাগ্র পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। বাৎসরিক দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ তিন কোটি ষাট লক্ষ লিটার। ২০১২-১৩ সালে ব্যবসা হয়েছে (টার্নওভার) ১১,৬৬৮ কোটি টাকা।

গুজরাটের মানুষ সমবায় আন্দোলনকে সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। সেখানে হরিণঘাটা, ডানকুনি বা উত্তরবঙ্গের 'হিমূল সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' কতদূর সাফল্য লাভ করতে পেরেছে? সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখলে অথবা আমলা মহলে কান পাতলে সমবায় ক্ষেত্রেও সংকীর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই, স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির কথাই চোখে পড়ে বা কানে আসে। এটা কেন?

সারা দেশেই দুধের বিশাল চাহিদা রয়েছে, আছে দুধ উৎপাদন ও সংগ্রহের বিরাট সম্ভাবনা। এতদ্‌সত্ত্বেও ২০১২-১৩ বছরে ১৩২.৪ মিলিয়ন টন দুধ উৎপাদিত হয়েছিল। যা সারা পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত দুধের ১৫ শতাংশ। বাজারমূল্য ২,৭০,০০ কোটি টাকা। ৮৭,৮২৪.২৭ টন দুগ্ধজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য

সদাতৎপর গুজরাটের দুগ্ধ বিপনন ব্যবস্থা।

ধুঁকতে থাকা হিমূল দুগ্ধ প্রকল্প।

ছিল— ১,৪১২ কোটি টাকা। বাংলাদেশ, মিশর, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, সৌদি আরব, আলজিরিয়া এবং ইয়েমেন প্রভৃতি দেশ ছিল প্রধান ক্রেতা। আমেরিকা ও কানাডার বাজারেও আমূলের উৎপাদিত পণ্য ঢুকে পড়েছে। যতদূর জানা যায়, এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে সাংগঠনিক ও কুশল পরিচালন ব্যবস্থা বা দক্ষতা, উৎপাদককেও সামিল করা, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং আধুনিক বিপণন ও বাজারব্যবস্থাকে কাজে লাগানো।

'আমূল পদ্ধতি' :

আমূল-এর পক্ষ থেকে প্রত্যেক গ্রামে সহজ সুদহীন শর্তে অন্ততপক্ষে একটি দুগ্ধবতী গাভি দেওয়া হয়। দুধের দামের একটি অংশ মূল ঋণ শোধের জন্য কেটে রাখা হয়। গোরু প্রতিপালন করতে গো-খাদ্য লাগে। বাজারে খরাপীড়িত এলাকায় ঘাসের অভাব মেটাতে ভর্তুকিতে উন্নতমানের গো-খাদ্য সরবরাহ করা হয়। গোরুর দুধ বাড়ে। গ্রামে গড়ে ওঠে দুগ্ধ সমবায় ও ভ্রাম্যমান দুধ-সংগ্রহ ব্যবস্থা। দুধের দাম মেটানো হয় নগদে।

গুজরাটের আনন্দ জেলার প্রত্যন্ত সন্দেশর গ্রামের চিনাইভাই জীবনভাই প্যাটেল ৪০ বছর আগে মাত্র দু'টি গাই নিয়ে শুরু করেছিলেন। আজ শ্বেত-বিপ্লবের ফলে দোতলা পাকা বাড়ি ও ১৫টি দুগ্ধবতী গোরুর মালিক। খোলা দুধে ভেজাল বদনাম এড়াতে 'আমূল' কোম্পানি 'আল্ট্রা (Ultra) হাই টেম্পারেচার প্যাকেজিং-এর কৌশল বা কারিগরি ব্যবহার করছে। এই পদ্ধতি দুধকে ৯০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত করতে সক্ষম।

আমূল-এর সাফল্যে উজ্জীবিত হয়েই ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী 'অপারেশন ফ্লাড'— কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতবর্ষ জুড়ে শ্বেত-বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। World Food Programme-এর অধীনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত মাখন তোলা গুঁড়ো দুধ বা Deemed Milk Powder থেকে উৎপাদিত দুধ বিক্রির অর্থকে ব্যবহার করেই 'অপারেশন ফ্লাড' কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। ২৪টি রাজ্যে পরবর্তীতে গঠিত হয়েছিল 'ডেয়ারি কো- অপারেটিভ ফেডারেশন।' তারই একটি ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ডেয়ারি এপ্লয়িজ ফেডারেশন।

পশ্চিমবঙ্গেও দুধের চাহিদা মেটায় 'আমূল'। অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যু ঘটেছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পের। গল্প-উপন্যাস, কাব্য ও বাস্তবেও বাঙালির শেষপাতে দুধের বাটিটা প্রায় অপরিহার্য ছিল। আরণ্যকের সত্যচরণ, শরৎবাবুর দত্তা, আর ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনি তো মা মহামায়ার কাছে বর চেয়েছেন— "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"; সেই গড়পড়তা বাঙালিকে এখন চাতকের মতো দুধের জন্য তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে গুজরাটের আমূলের দিকে। বাঙালির গোয়ালভরা গোরুও নেই, নেই গোলাভরা ধান বা পুকুরভরা মাছ। এ লজ্জা রাখার জায়গা নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি বাদে কংগ্রেস এবং তাবৎ আঞ্চলিক দল গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যতই সমালোচনা, কটু-কাটব্য বক্রোক্তি করুন না কেন মোদী দিন দিন ভারতবাসীর অস্মিতা ও স্বচ্ছ, দক্ষ প্রশাসক হিসেবে দেশের মানুষের অন্তরে আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে সমবায়ে দলাদলি বা লুঠ হয় না গুজরাটে।

উত্তরবঙ্গের 'হিমূল'-এর বারোমাস্যা :

১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের অপারেশন ফ্লাড-এর অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে কো-অপারেটিভ 'সোসাইটি' আইনে তৈরি হয়েছিল— দি হিমালয়ান কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড। যাকে উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্রাকারে 'হিমূল' বলা হয়। ১৯৭৬ সালে ১ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থাটিকে পরিচালনা করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সমবায়ের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল আমূলের মতোই হিমূলও স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত দুধ থেকে অন্যান্য দুগ্ধজাত সামগ্রী তৈরি করে রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে বাজারজাত করা হবে।

এক আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিলিগুড়ি শহর থেকে কিছুটা দূরে খাপরাইলে এই বহুমুখী দুগ্ধ প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পাহাড়ীক্ষেত্র থেকেও ড্রামে ভরে দুধ, মাখন আসত। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড থেকে পাড়ায় পাড়ায় দুধ সরবরাহ করা হোত। শহরে বেশ কয়েকটি স্থায়ী মাখনের নির্দিষ্ট দোকান গড়ে উঠেছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল পাহাড় ও সমতল ক্ষেত্রের গো-পালকদের ন্যায্য দামে দুধ বিক্রির। আমূলের পথকেই নীতিগতভাবে 'হিমূল' গ্রহণ করে বা অনুসরণ করেই চলছিল। তৈরি হচ্ছিল দুগ্ধ-উৎপাদক সমবায় সমিতি। পাহাড়ে মহিলা দুধ উৎপাদক সমিতি গড়ে উঠেছিল ৩০টি সহ ১৯২টি প্রাথমিক সমিতি। শিলিগুড়ির সমতলেও ছিল ৩২টি প্রাথমিক সমিতি। দৈনিক দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল— উনিশ থেকে কুড়ি হাজার লিটার। যার মধ্যে ৬৭ শতাংশ সরবরাহ আসত পাহাড় এলাকা থেকে আর ৩৩ শতাংশ সমতল এলাকা থেকে। এবাদে আরও অন্যান্য মিল্ক প্রডিউসার ফেডারেশন থেকেও দুধ সংগ্রহ হোত। 'হিমূল' চার রকম দুধ তৈরি করে সরবরাহ করত—টোন্ড, ডবল টোন্ড, স্কিম (বাজারি নাম পুস্তি) এবং গোরুর দুধ-সুরভি। এছাড়াও 'হিমূল' বাজারে পাঠাতো ঘি, লস্যি, মিষ্টি দই ও সুগন্ধি দুধ। ১৯৮০ সালে 'হিমূল' (HIMUL) ১০০ মেট্রিকটন উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত গো-খাদ্য তৈরির কারখানার পরিচালন-স্বত্ব পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে। চাররকমের গো-খাদ্য তৈরি হোত, স্বল্পমূল্য ও উচ্চ মূল্যের।

'হিমূল'-এর অবনমন, ক্রমাবনতি ও নাভিশ্বাস :

রোগের মূলে গিয়ে উপাচারের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক ফায়দা, একদলের সরকারের উপর অন্যদলের সরকারের প্রতি অভিযোগ, দোষারোপ করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের প্রতিযোগিতা চলছে। আজ প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঁচে থাকলে হয়ত বা শোধরানোর চেষ্টা করতেন আর তা না করতে পারলে আত্মহত্যা করতেন— এমনই

মনে হয় সব কাণ্ড-কারখানা দেখে। রামরাজত্বে 'হিমুল' আজ মুমূর্ষু, ওদিকে কংগ্রেসী রাজত্বে বিধানবাবুর স্বপ্নের হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পের অপমৃত্যু ঘটে গিয়েছে অনেক আগেই।

গত তিন বছরে তৃণমূল সরকারের সম্ভবত স্ট্যান্ডিং ইন্সট্রাকশানই হলো সব দায় ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের অপশাসন-কে দায়ী করা। গুজরাটের 'আমূল' উৎপাদন সংস্থা কংগ্রেস ও বিজেপি দলের শাসন সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে চলেছে। অর্থব্যবস্থার বৈশীকরণ ও ভারত সরকারের এফ ডি আই (বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ)-এর সামনে দাঁড়িয়েও সমান বৃহত্তম দুগ্ধ সমবায় সংস্থার রাজমুকুট মাথায় ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তফাতটা কোথায়?

ক'দিন আগে মোদী নিজেই কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় ভাষণের শেষ দিকে একটা স্লোগান উল্লেখ করেছিলেন যা নিতান্তই বামমার্গীদের প্রায় একচেটিয়া ছিল— চলবে না চলবে না। পূর্ব পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তো পাঠানো 'চলবে না'। কিন্তু কোথায় পাঠানো চলবে তাও বলা হবে না।

সমবায়েও লুটের রমরমা :

গুজরাটে সমবায়কে যখন চোখের মণির মতো রক্ষা করা হয় তখন বামপন্থার গবেষণাগার বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গে সমবায় প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির আখড়া ও লুঠের ভাণ্ডার বলে মনে করে তার অস্থি-মজ্জাও ছিবড়ে করে দেওয়া হয়। এই বামপন্থী সংস্কৃতির কিছুটা পরিচয় পাঠকবর্গ মিখাইল সলোকভের 'ভার্জিন সয়েল অপটার্ন' উপন্যাসে পেতে পারেন।

হিমুলের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র ছিল ১ লক্ষ লিটার। লক্ষ্যমাত্রার ২৫ শতাংশের বেশি কখনও উৎপাদন করা যায়নি। অথচ প্রথমেই ১ লক্ষ লিটার উৎপাদনের কথা মাথায় রেখে কর্মী নিয়োগ করা হয়। ভাবার প্রয়োজন বোধ হয়নি সবার শ্রমকে ব্যবহার করা যাবে কি না? বহুক্ষেত্রেই কর্মী নির্বাচন করা হয় রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশে। ফলে উৎপাদন কর্মীর বদলে অফিস কর্মীর সংখ্যাধিক্য। শাসকদলের রাজনৈতিক স্বার্থে হিমুল মাথাভারী প্রশাসনে পরিণত হলো।

গুজরাটে আমূলের প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ৩০ লক্ষ। সেখানে সত্যিকারের শ্বেত বিপ্লব ঘটেছে। হিমুলের ছবি ঠিক বিপরীত।

হিমুলের বর্তমান চিলিং প্ল্যান্ট

মাটিগাড়া	—	ক্ষমতা	৬৬০০০	লিটার
ঘুম	—	”	১০,০০০	”
বিজনবাড়ি	—	”	৪,০০০	”
রিমবিক	—	”	২,০০০	”
কালিম্পং	—	”	৪,০০০	”
লাভা	—	”	২,০০০	”

হিমুল প্রাথমিক সমিতি থেকে সংগৃহীত দুধের দামও দিতে পারছে না। আস্থা হারাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই। বাইরে থেকে দুধ আমদানি করতে হচ্ছে। অথচ হিমুল ও উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ৫টি জেলার পরিবর্তন এনে দিতে পারতো। এক যথার্থ বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে পারত।

লুঠ শুরু হয়েছিল মাথাভারি প্রশাসনের মাথা থেকেই। দার্জিলিং এর জেলাশাসক ছিলেন মুখ্য প্রশাসক। নেপালের ধুলাবাড়ি থেকে হিমুলের অর্থে কেনা হয়েছিল এক মূল্যবান ক্যামেরা। আর যাই হোক ক্যামেরা থেকে তো দুধ বের হয় না। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। হিমুলের অর্থে ওইভাবে ক্যামেরা কেনা যায় কিনা তা আমার জানা নেই। সেই মূল্যবান ক্যামেরাটি কিন্তু হিমুলের দপ্তরে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এখন মাত্র ১০-১২ হাজার লিটার দুধ সংগ্রহ করে হিমুল তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে কোনও মতে। অথচ শিলিগুড়ি শহরেই দুধের চাহিদার পরিমাণ ৩০ হাজার লিটার।

হিমুলের কর্তৃপক্ষ একটি শিল্পকে অগ্রগতির পক্ষে এগিয়ে নেওয়ার যাবতীয় উপাদান হাতে পেয়েও কেন ব্যবহারে অক্ষমতা জাহির করল তা অবশ্যই রহস্যজনক। গুজরাটের 'আমূল' ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর পশ্চিমবঙ্গের হিমুল সমবায় ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। আশঙ্কায় ঝুলছে ১৫৫ জন কর্মীর ভবিষ্যৎ।

(তথ্যসূত্র : উত্তরবঙ্গ সংবাদ)

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER
OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com web : www.calcuttawaterproofing.com

হিন্দু শব্দটি শুনলেই তাদের কান গরম হয়, চোখ লাল হয়, হিন্দুত্বই যে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক তত্ত্ব তা মানতে রাজি নয়

অমলেশ মিশ্র

এই একাত্ম মানববাদ ঈশ্বরের সঙ্গে জাতিভেদ ব্যবস্থা এবং রিলিজিয়নভিত্তিক সম্প্রদায় ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। মানুষ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল— এ কখনও মানবতার বিচারে সমর্থনযোগ্য নয়। একই ভাবে সম্প্রদায়গতভাবে কে খৃস্টকে মানে কে বুদ্ধকে আর কে আল্লাহকে মানে তাও বিচার্য নয়। মানব কল্যাণমুখী ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি, রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করবে। যে যার বিশ্বাস নিয়ে থাকতে পারে তবে তার বিশ্বাসই যে একমাত্র সত্য বিশ্বাস এটা মানার বাধ্যতা নেই এবং তার সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সে মানবতাবাদের ক্ষতি করার অধিকারীও নয়। মানুষের বিচার হবে তার কর্মের ভিত্তিতে। তার জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বা তার ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। রাজশক্তি সর্বদাই নিরপেক্ষ থাকবে— জাতি, সম্প্রদায় বিশ্বাস বা ধর্মের ক্ষেত্রে। সরকারের অনুদান বিতরণ করা হবে আর্থিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের— তার জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস বা সম্প্রদায় যাই-ই হোক না কেন।

ছোটখাটো সমস্যার কথা বাদ দিলে এই ব্যবস্থাকেই আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এই তত্ত্ব মানতে স্বাভাবিকভাবে কারোরই অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি বলা যায় যে এটিই হিন্দু দর্শনের উপর আধারিত ব্যবস্থা, তখন অনেকেই মুখ ঘোরাবেন। তাদের উপর সেমেটিক প্রভাব (খৃস্টান-ইসলাম-ইহুদি) এত বেশি যে 'হিন্দু' শব্দটি শুনলেই তাদের কান গরম হয়, চোখ লাল হয়। হিন্দুত্বই যে সারা বিশ্বে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক তত্ত্ব একথা তারা মানবেন না। হিন্দু বিদ্বজ্জনের কাজটা ঠিক এখানেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে, শিক্ষালয়ের ক্ষেত্রে, সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে এবং সমাজসেবার অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের এইটি প্রচার করতে হবে এবং হাতে নাতে কাজ করে দেখাতে হবে। এই কাজ করতে হলে— 'হিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ' বলে যে অলিখিত, অবিজ্ঞাপিত বেড়াটি আছে— তা ভাঙতে হবে। এই ভাঙার কাজ একার শক্তিতে হবে না। চাই সঙ্ঘশক্তি। সঙ্ঘশক্তি তৈরি করতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সব ধরনের হিন্দুকেই মানবতার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সারা পৃথিবীর সব দেশেই এই মানবতা ভীষণ রকম অবহেলিত। অন্য অনেক রকম ক্ষুদ্র স্বার্থ এই মানব-স্বার্থর বিরুদ্ধে কাজ করছে। সেইগুলিকে শনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। সারা বিশ্বকে ভারতবর্ষ এই মানবতার শিক্ষা দিতে পারে। এবং আপাত অবিশ্বাস্য মনে হলেও একথা নির্ভেজাল সত্য যে— হিন্দুত্বই সেই মানবতার শিক্ষা দিতে পারে।

পৃথিবীতে হিন্দুত্ব ছাড়াও অনেক ভাবাদর্শ আছে। সেই সব ভাবাদর্শ নিয়ে অনেক দেশই পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু সেই ভাবাদর্শগুলি মানবের একাত্মতায় বিশ্বাস রাখে না। মানব জাতিকে তারা নানা ভাগে ভাগ করে রেখেছে। এবং এই ভাগগুলি সাম্প্রদায়িক ভাগ, বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভাগ। আবার এই বিশ্বাসগুলিও সর্বদা যুক্তিসিদ্ধ ন্যায়সিদ্ধ নয়। এই ভাবাদর্শগুলি বিশ্বাস করে না যে— মানুষ মাত্রেই অমৃতের পুত্র।

মানুষ মাত্রেই অমৃতের পুত্র— এই ধারণা থেকেই মানবতাবাদের জন্ম। এই ধারণায় সর্বতোভাবে বিশ্বাস না রাখলে সম্প্রদায়, জাত-পাত প্রভৃতি বিভিন্নতার ঊর্ধ্বে ওঠা যায় না। 'প্রতিবেশীকে ভালবাস'— অর্থে যে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিবেশীকেই ভালবাসতে হবে। হেমায়তে ইসলাম নয়, হেমায়েতে ইনসান হতে হবে। তবেই মানবজাতির জন্য কাজ করা হবে।

হিন্দুত্ব এবং একাত্ম মানববাদের ভিত্তিই হলো— যেহেতু মানুষমাত্রেই অমৃতের পুত্র অতএব হেমায়েতে ইনসান, প্রতিবেশী মাত্রকেই ভালবাস। সে খৃস্টান হলেও ভালবাস, মুসলমান হলেও ভালবাস, হিন্দু হলেও ভালবাসা, বৌদ্ধ বা ইহুদি বা কনফুসী বা জৈন হলেও ভালবাস, সে ঈশ্বরবাদী হলেও ভালবাস, নিরীশ্বরবাদী হলেও ভালবাস। আমার ভালবাসা তার পাওনা কারণ সেও তোমার মতো অমৃতের পুত্র। এক আত্মার আত্মীয়।

ধর্ম বলে যদি কিছু মানতেই হয় তবে এই মানবতার ধর্মকেই মানতে হয়। এখন অনেক ধর্ম বিশ্বাস বা রিলিজিয়ন আছে সেগুলি সরাসরি এই মানবধর্মকে অস্বীকার করে। তাদের ধর্মবিশ্বাসের বাইরের কাউকে মানুষ বলে মানতেই রাজি নয়।

ফলে 'সব ধর্মই এক', 'সব ধর্মই সত্য' ইত্যাদি বাগাড়ম্বর করার থেকে 'সব ধর্মই মিথ্যা' বলা বরং কম বিপজ্জনক। তাহলে অন্তত কুসংস্কারে বিশ্বাস, অর্ধসত্যে বিশ্বাস ও অসত্যে বিশ্বাস-এর হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো যাবে।

এই প্রসঙ্গে কবি রুমির ফার্সি ভাষায় একটি কবিতা আছে—

আল্‌কি গোয়াদ্ জুমলাহ্ হক্
অস্ত আহমকি অস্ত্
ওয়া আল্‌কি গোয়াদ্ জুমলাহ্ বাতিল খান
শকি অস্ত্

অর্থাৎ যে বা যারা বলেন সব ধর্মই এক, তারা মূর্খ আবার যারা বলে সব ধর্মই মিথ্যা— তারা বদমাশ।

এক পরিবারে ১৬৬ ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে ভোট একটা বড় উৎসব। পাঁচ বছর পর এই একটা সময় যখন নেতা-মন্ত্রীরা ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে জোড়হাতে বিনীতভাবে তাদের ভোট প্রার্থনা করেন। এই একটি সময়ই ভোটারদের মনে হয় তারাই ক্ষমতার আসল মালিক। তবে যে পরিবারে বেশি ভোটার সেই পরিবারের বেশি কদর। নেতা-মন্ত্রীদের সেই পরিবারে ঘন ঘন পদধূলি পড়ে।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জিয়োন্ধাকা চানা (ডান দিকে)।

উত্তরপূর্বাঞ্চলের মিজোরামের বাসিন্দা জিয়োন্ধাকা চানার এই সময়ে কদর খুবই বেড়ে গিয়েছিল। কারণ তাঁর ৩৯ জন স্ত্রী ও নাতিনাতনি ১২৭ জন। এর থেকে বড় কথা তাঁর ঘরে ১৬৬ জন ভোটার আছে। এক কথায় তাঁর পরিবার একটা ভোটব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এই কারণেই তাঁর ঘরে নেতাদের লাইন লেগে যায়। যে নেতা এই পরিবারের সমর্থন পাবেন তাঁর জয় অবশ্যম্ভাবী।

গ্রামে শ্রীচানা পরিবার সহ ১০০টি ঘরের একটি বাড়িতে থাকেন। জানা গেছে, প্রায় ৭ লক্ষ ভোটারের এই মিজোরাম লোকসভার আসনটি যে কোনো প্রার্থীর জেতার জন্য একটি ভোটই খুবই উপযোগী প্রমাণিত হয়।

৭০ বছর বয়সের চানা বলেন, ‘‘এই আসনে ১০০ ভোটের মার্জিনে কোনো প্রার্থীর পাল্লা ভারী করতে পারে। বৃটিশ খবরের কাগজ ‘ডেলি মেল’কে তিনি বলেছেন, গত কয়েকদিন থেকে ভোট চাইতে তাঁদের বাড়িতে নেতাদের ভীড় লেগেই থাকতো। প্রতি ভোটের সময় তাঁদের চাহিদা বেড়ে যায়। এই সিটে জয়ের ফারাক খুব কম হয়, সেজন্য ১০০ ভোটও তার জন্য খুব মূল্যবান।

এই বাড়িতেই থাকেন চানা-পরিবার।

চানার এক স্ত্রী রিঙ্কামিনী জানালেন, ‘আমরা সবাই এক জায়গায় ভোট দিই। আমাদের পরিবার থেকেই ১৬৬ ভোট পাক্কা।’

বেশিরভাগ ভোটারের মতো চানাও পরিচ্ছন্ন ও বিকাশকারী সরকার চান। তিনি বলেন, ‘‘আমরা ভাল সরকার চাই, যে নিজের স্বার্থ না দেখে দেশের জন্য কাজ করবে।’’

খবরের শিরোনামে আসার পর চানার পরিবার দেখার জন্য লোকেদের উৎসাহ বেড়ে গেছে।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"হে মানব, তুমি যেই হও না কেন, জাতির এই প্রয়োজনের মুহূর্তে যে কাজ করছ, তোমার সেবা-রূপ সেই অস্ত্রখানি হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করে রাখ। পরিশ্রমকালে তোমাদের দেহ, মন এক হোক, প্রতিটি মাংসপেশী দৃঢ়সংবদ্ধ হোক, প্রতিটি স্নায়ু একাগ্র হোক। তোমার সমস্ত প্রচেষ্টা এই কাজে নিযুক্ত হোক।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সত্তা-সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই শুরু

এন. সি. দে

ভারত এক বৃহৎ উদার-গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় কেবল উদার-গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যেমেই। যারা এদেশের জাতীয়তায় বিশ্বাস করে না, সংবিধানে বিশ্বাস করে না, যারা ''মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান— মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।'' —কবির ভাবনার মর্যাদা না দিয়ে হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা দুটি জাতির মর্যাদা দিয়ে দেশটিকে দু-ভাগ করেছিল, তারাই এদেশের উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশে তেলে-জলে পরিপুষ্ট হয়ে এদেশে থেকে যাওয়া মুসলমানদের গায়েও নিত্য সাম্প্রদায়িক বাতাস দিয়ে যাচ্ছে। এইসব হিন্দু বিদ্বেষী হিন্দুরা এদেশের উদার সংখ্যাভিত্তিক গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে সম্প্রদায়গতভাবে বিভাজিত করতে উদ্যত হয়েছে।

কমিউনিস্ট বুদ্ধদেব মুসলমান অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদে গিয়ে বলছেন, 'নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এলে আবার দাঙ্গা হবে'। মমতা মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলিতে মুসলমানী সেজে বলছেন, মুসলমানের রক্তে রাঙা নরেন্দ্র মোদীর হাতে সরকার গড়তে কিছুতেই দেবেন না। কংগ্রেসের মা-মেয়ে-ছেলের মুখে সর্বদা-সর্বত্র দাঙ্গার কাহিনী উচ্চারিত ও প্রচারিত হচ্ছে। তাদের পোঁ-ধরা কংগ্রেসী নেতারাও গুজরাট দাঙ্গার কথা স্মরণ করিয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগ্রত করে চলেছে। তথাকথিত হিন্দু নেতাদের মুখে এই ধরনের উস্কানিমূলক কথার ফলে সারা হিন্দু সমাজ বিশ্বের কাছে কলঙ্কিত দাঙ্গাবাজ বলে চিহ্নিত হচ্ছে; অন্যদিকে মুসলমান সমাজে তৈরি হচ্ছে এক স্থায়ী হিন্দু-বিদ্বেষ। ধর্মীয় ভাবেই মুসলমানরা এক পরধর্ম-বিদ্বেষী অসহিষ্ণু সম্প্রদায় হওয়ায় এই উস্কানিতে উল্লসিত হয়ে শপথ নিচ্ছে নরেন্দ্র মোদীকে কেটে টুকরো-টুকরো করবে। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসের এই মুসলমান প্রার্থীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস-নেতৃত্ব কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তো নেয়ইনি উল্টে তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাহুল গান্ধী প্রচার সভায় তাকে ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বানও জানিয়েছে। এক কথায় দেশের সব কটি রাজনৈতিক দল, এমনকী মৌলবাদী মুসলমান মোল্লা-মৌলবী-ইমামের দলও নরেন্দ্র মোদীকে রুখতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

এই পটভূমিকায় এবারের নির্বাচন পর্ব ১২টি রাজ্যের প্রায় অর্ধেক আসনে সমাপ্ত হয়ে গেছে। বাজারি পত্রিকাগুলি খুবই গদগদ হয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের খতিয়ান দিতে শুরু করেছে। কারণ গত লোকসভা নির্বাচন (২০০৯)-এর তুলনায় এবার সব রাজ্যেই ভোট দানের সংখ্যা বেড়েছে। ছত্তিশগড়ে এবার ভোট পড়েছে ৩টি আসনে ৬৩.৫ শতাংশ। ২০০৯-এ ৫৭ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে এবার ১১টি আসনে ভোট পড়েছে ৬২.৫ শতাংশ। ২০০৯-এ ৫৪.২ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডে ৬টি আসনে ৬২.০ শতাংশ। ২০০৯-এ ৫০.৫ শতাংশ। মহারাষ্ট্রে ১৯টি-তে ৬১.৭ শতাংশ। ২০০৯-এ ৫৪.১ শতাংশ। বিহারে ৭টি আসনে ৫৬ শতাংশ। ২০০৯-এ ৩৯.৩ শতাংশ। মধ্যপ্রদেশে ১০টি আসনে ৫৪.৪ শতাংশ। ২০০৯-এ ৪৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ ৪টি আসনে ৮১.৪ শতাংশ। ২০০৯-এ ৮০.৬ শতাংশ। মণিপুর ১টিতে ৭৪ শতাংশ। ২০০৯-এ ৭০.৪ শতাংশ। ওড়িশায় ১১+৭০টি বিধানসভায় ৭০ শতাংশ। ২০০৯-এ ৬৬.১ শতাংশ। জম্মু-কাশ্মীর ১টিতে ৬৯ শতাংশ। ২০০৯-এ ৪৪.৯ শতাংশ। কর্ণাটক ২৮টি-তে ৬৬ শতাংশ। ২০০৯-এ ৫৮.৮ শতাংশ ও রাজস্থানে ২০টি আসনে ৬৩.৩ শতাংশ। ২০০৯-এ ৪৮.১ শতাংশ।

এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে এবারের নির্বাচনে ভোটদাতাদের ভোটদানের উৎসাহ আগের বারের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এর কারণ কী? এটা কী সামগ্রিকভাবে দেশের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের রাষ্ট্রীয় চেতনার বৃদ্ধির ফল? না কি এটা একটি সংঘটিত সম্প্রদায়ের পরিকল্পনার প্রতিফলন? এর পরিণাম একটি অপরিকল্পিত,

উদার, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অমঙ্গল ডেকে আনবে না তো? এইসব প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা আজ অত্যন্ত জরুরি।

উদারতা একটি গুণবাচক শব্দ। তবে তা শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়। যেমন অহিংসা। এটিও একটি ব্যক্তিগত গুণ বিশেষ। রাষ্ট্রের পক্ষে অবাস্তব, অযাচিত, অর্থহীন, অবিবেচক উদারতা প্রদর্শন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক প্রবণতা। হিংস্রতার বিরুদ্ধে অহেতুকি বোধবুদ্ধিহীন অহিংসা প্রদর্শনের পরিণাম কেবল মাত্র হিংস্রতার শিকারে পরিণত হওয়া। ঠিক যেমনটি হয়েছিল প্রাচীন হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের পরিণাম। মহম্মদ ঘোরি বারবার ভারত আক্রমণ করেও পৃথ্বীরাজের হাতে পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছিল, কিন্তু পৃথ্বীরাজ বারবার তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করে ছেড়ে দিয়েছিল। অথচ পৃথ্বীরাজ যখন পরাজিত হয়ে মহম্মদ ঘোরির হাতে বন্দী হয়েছিল ঘোরি তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেনি, করেছিল চরম নৃশংসভাবে হত্যা। একজন হিন্দু রাষ্ট্র প্রধানের এই অহেতুক উদারতা প্রদর্শন গোটা রাষ্ট্র ও জাতির পক্ষে এনেছিল চরম লাঞ্ছনা ও শতাধিক বছরের পরাধীনতা।

অবাস্তব, অবিবেচক, অহেতুক ও দায়হীন উদারতা একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো সংখ্যা। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যেই একটি দল বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় আমাদের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংসদ দখল করে নিতে পারে। সংখ্যাই মহত্ত্বপূর্ণ, সংখ্যার গুণগত বিচার গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই সংখ্যাধিক্যের চরিত্রগুণে রাষ্ট্রের গুণগত পরিবর্তনও এখানে নীরবে ঘটে যেতে পারে। সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এখানে সমান গণতান্ত্রিক অধিকার। সংখ্যাগরিষ্ঠের গুণগত বিচার এখানে না থাকায়, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সংখ্যা বৃদ্ধির গোপন অশুভ প্রতিযোগিতা চলাটাই স্বাভাবিক, বিশেষ করে মৌলবাদী, পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত কোনও সম্প্রদায় যারা ইতিমধ্যেই যেসব দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কায়েম করেছে নিজস্ব ধর্মীয় মৌলবাদী রাষ্ট্র, অর্জন করেছে ধর্মনিরপেক্ষতা, তাদের পক্ষে সংখ্যাবৃদ্ধির এই অশুভ খেলাটাই স্বাভাবিক। এই ধরনের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রিকভাবে অসম্ভব। অসচেতন আদর্শবান জনগোষ্ঠী এই জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার দীর্ঘকালীন শিকারে পরিণত হতে বাধ্য। ঠিক এমন প্রমাণই পাওয়া গিয়েছিল ১৯৯১-২০০১ দশকের সেন্সার্স রিপোর্টে। হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে কেবল ২০.৩ শতাংশ, সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩৬ শতাংশ। এই তথ্য জানাজানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০০৪ সালে ক্ষমতায় এসেই কংগ্রেস সরকার তৎকালীন সেন্সাস কমিশনার জে. কে. বানথিয়াকে অপসারণ করে ২০০১ থেকে ২০১১ দশকে জনগণনায় এই তুল্যমূল্য সংখ্যা গণনা পদ্ধতি বন্ধ করে দেয় মূলত মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি গোপনে চালানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই।

সচেতন হিন্দু নাগরিকদের কাছে ১৯৯১ থেকে ২০০১ দশকের হিন্দু-মুসলমান তুলনামূলক সংখ্যা বৃদ্ধিকে দিগদর্শন হিসেবে গ্রহণ করে সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ এদেশের সংবিধান রচয়িতাগণ সাংবিধানিক আইন-কানুন রচনা করেছেন শুধু দিব্যজ্ঞানের ভিত্তিতে, কাণ্ডজ্ঞানের ভিত্তিতে নয়। সংখ্যার ভিত্তিতে এদেশে সবকিছু জয় করা সম্ভব। কোন জেলা কতগুলি লোকসভা আসন পাবে তাও ঠিক করার বিধান ওই জনসংখ্যার ভিত্তিতেই। ভারতবর্ষের অনেক জেলা আছে যেগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে যদি আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে তো সেইসব জেলাগুলিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ না করার জন্য পুরস্কৃতই করা হবে। আর যেসব রাজ্য বা জেলা জনসংখ্যা কমাবে তারাই আসনসংখ্যা কম পাবে অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিরস্কৃত হবে। পরিণামে সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীই লোকসভায় তাদের প্রতিনিধি বেশি পাঠাবে। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় সব দলই মুসলমান প্রার্থীই দাঁড় করায়। ধর্মনিরপেক্ষতার পরকাষ্ঠা দলগুলি সেইসব অঞ্চলে হিন্দুপ্রার্থী দাঁড় করানোর কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না। এই কৌশলটাই পরিকল্পিতভাবে মুসলমান গোষ্ঠীপতিরা প্রতিটি আদর্শহীন ক্ষমতালোভী হিন্দু নেতা বা দলগুলির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। একদল মুসলমান কমিউনিস্ট পর্যন্ত আজ দাবি করছে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে মুসলমানদের বসাতে হবে।

সংবিধানের বিধান অনুযায়ী যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জেলাগুলিতে এবং সংসদের আসন সংখ্যা কাণ্ডজ্ঞানহীন হিসাবে বাড়ানো হয়, তাহলে সংসদে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির আনুপাতিক হারে ব্যাপক বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

আজ ভোটদানের হার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারি পত্রিকাগুলি আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জয়গান শুরু করেছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অস্তিত্ব, সত্তা সংস্কৃতি রক্ষায় কোনও দায় নেই। তাই দেশকে দাঙ্গার জুজু দেখিয়ে একটি সংগঠিত জনগোষ্ঠীকে সম্প্রদায়গতভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করা দেশের পক্ষে মোটেই শুভ নয়। অতীতে আমাদের দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারক-বাহকদের জন্যই। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের উচিত সংবিধানের আশু সংশোধনে একটু কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া। সংখ্যার শুষ্ক ভিত্তিতে শুধু নয়, গুণগত বিচারের ভিত্তি আসন সংখ্যা বৃদ্ধির বিচার্য হওয়া উচিত। তা না হলে সংখ্যার যে কোনো হার বৃদ্ধিতে দেশের রাষ্ট্রপ্রেমিকদের আশঙ্কিত হওয়ার কারণ থাকবেই। কারণ পৃথিবীর বহু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে আজ রাষ্ট্রচ্যুত হয়েছে এবং মৌলবাদী জনগোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করেই পুরানো সংস্কৃতির সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। যেমন আফগানিস্তানে তালিবানি আক্রমণে বামিয়ান বুদ্ধমূর্তিগুলি আজ নিশ্চিহ্ন।

মালীতে ইসলামী উগ্রপন্থীরা সব সুফি গুম্ফাগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। নাইজিরিয়া, মালদ্বীপ সর্বত্র ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন করার এক খেলায় মেতেছে তারা। মুসলিমদের সুফি গোষ্ঠীই ২০১১ সালে দাবি তুলেছিল কট্টর ওয়াহাবীদের বর্জন করুন, তারা গোটা মুসলমান সমাজকে কলঙ্কিত করছে। আর আমরা আতঙ্কিত হব না! নির্বাচনে কারা বেশি সংখ্যায় ভোট দিয়েছে, এটাই ভারতের ভবিষ্যৎ দিক্‌নির্দেশ করবে।

লোকসভা নির্বাচন - ২০১৪

পথে চলতে চলতে যা জানা যাচ্ছে

দেবব্রত চৌধুরী

পথেঘাটে আজ মাত্র একটিই আলোচ্য বিষয়— আগামী ১৬ মে-র পরে দেশে দিল্লীর গদিতে কে বসবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কোন দল কটা করে সিট পাবে। অনেক রাজনৈতিক পরিসংখ্যানবিদ নানারকম সংখ্যা বলছেন, আজ আমাদের সাধারণ মানুষেরও একই জিজ্ঞাসা— কি হতে পারে, কোন দল কতজন সংসদকে দিল্লীতে পাঠাতে পারে। একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক পশ্চিমবঙ্গে কারা কজন পারে দিল্লীতে সাংসদ পাঠাতে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার সংখ্যা ৬ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৮৮। এ পর্যন্ত ভোটদানভিত্তি ৮০ শতাংশ। ভোট দেবে ৫ কোটি। এখন প্রশ্ন, এই ৫ কোটি ভোটার এবার কোন দলকে ভোট দেবে। পথে-ঘাটে বাসে-রেলে আলোচনার মাধ্যমে যে চিত্রটি উঠে আসছে সেটি পর্যালোচনা করলে মনে হচ্ছে এমন হতে পারে (তবে ১৬ মে-র মধ্যে অনেক পরিবর্তনও হতে পারে)।

ভোট পেয়েছিল ২০০৯ সালে দলগতভাবে টিএমসি-কংগ্রেস ৪৮%, বামফ্রন্ট ৪১%, বিজেপি ৬.১৪%, অন্যান্য ৫%।

২০১৪-তে ভোট পেতে পারে টিএমসি ৩৮%, কংগ্রেস ১০%, বিজেপি ১৪%, বামফ্রন্ট ৩৪%, অন্যান্য ৪% ।

এখন দেখার দলগতভাবে এই হারে ভোট পেলে কোন দল কতজন সাংসদ দিল্লীতে পাঠাতে পারবে। যদিও বড়দল টিএমসি-র ক্ষমতা দক্ষিণবঙ্গে যত শক্ত উত্তরবঙ্গে তত নয়। অন্যদিকে কংগ্রেসের শক্তি উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ। বামফন্টের শক্তি কিন্তু সমস্ত পশ্চিমবঙ্গেই আছে যদিও আগের মতন দৃঢ় নয়। ভারতীয় জনতাপার্টি সম্প্রতি 'মোদী হাওয়ার' পর পুরো পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রভাব ফেলতে পেরেছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সাংগঠনিক ভাবে দলটি তত মজবুত নয়। জনগণের একটি প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকা সত্ত্বেও দলটির সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকার জন্য যেভাবে এ রাজ্যে সাংসদ বাড়াবার সুযোগ পেয়েছিল সেই ভাবে ফল পাবে বলে মনে হয় না। তবু হলপ করে বলে যায় গত কুড়ি বৎসর ধরে এই দল যে হারে জনসমর্থন পেয়েছে এবারে তার চেয়ে অনেক বেশি পাবে। বিশেষ করে মোদী-হাওয়ার জন্য। তবে একথা না বলে পারা যাচ্ছে না যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি একজন বাঙালি, এই দলটির সাংসদ বিধায়ক কমিশনার পঞ্চায়েত সদস্য আজও আছে যদিও দলটি রাজ্যে তার জনপ্রিয়তা অনেক হারিয়েছে। ১৯২১-এ আরেক বাঙালি মানবেন্দ্র রায় কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দলের থেকে অনেক পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটি বিধায়ক সাংসদ আছেন, এমনকী প্রায় ৩৪ বৎসর এই দলটি পশ্চিমবঙ্গ শাসন করেছে। মীরাট ষড়যন্ত্রের পরে আর এস পি দল গঠনের পার্টির অন্যতম হোতা ছিলেন এক বাঙালি যোগেশ চট্টোপাধ্যায়। এই আর এস পি পার্টিরও এম এল এ এমপি কমিশনার পঞ্চায়েত আছে পশ্চিমবঙ্গে। নেতাজী ১৯৩৯-৪০ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে ফরোওয়ার্ড ব্লক দলটি গঠন করেছিলেন। মাত্র এক বৎসর তিনি নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন। এই দলেরও সাংসদ বিধায়ক কমিশনার পঞ্চায়েত সদস্য এ বর্ষে আছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫১ সালে ২১ অক্টোবর ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইতিহাস সম্ভ্রম ও অর্থনীতিতে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ গঠন করেছিলেন জনসঙ্ঘ, বর্তমানে যে দলের নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। দল গঠনের পর এই দলটির সাংসদ, বিধায়ক কমিশনার পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গে বাদে সব প্রদেশেই পাওয়া যায়। এমনকী কয়েকটি রাজ্য শাসন করছে এ দল। লোকে বলছে আগামীদিন ভারত শাসন করবে এক বাঙালি বীর মস্তিষ্কপ্রসূত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের তৈরি ভারতীয় জনতা পার্টি। কিন্তু বাঙালি হয়ে এই বেদনা চেপে রাখতে পারেছি না ড. শ্যামাপ্রসাদের তৈরি দলকে এ রাজ্যে তেমনভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙালির কাছে আজও সম্মানের সঙ্গে বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষের সন্তান বীর শ্যামাপ্রসাদ। মোদীর উত্থানে বাঙালি স্বপ্ন দেখছে এবার হয়তো ভারতীয় জনতা পার্টির ২/৩ জন বাংলার সাংসদকে দিল্লীর পার্লামেন্টে দেখা যেতে পারে। জনগণের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে এবার বাংলা থেকে দলগতভাবে সাংসদ থাকতে পারে— টিএমসি-২০, বামফ্রন্ট-১৬, কংগ্রেস-৪, বিজেপি-২, অন্যান্য-০। কিন্তু এও জানা গেছে বিজেপি-র প্রতি বাঙালি জনগণের আস্থা বাড়ার জন্য টিমসি দল নিম্নলিখিত আসনে মুস্কিলে পড়তে পারে—

(১) যাদবপুর (২) হাওড়া (৩) বাঁকুড়া (৪) বারাসত (৫) উত্তর পশ্চিম কলকাতা (৬) শ্রীরামপুর (৭) দমদম (৮) আসানসোল।

আশা করা যাচ্ছে দলগত ভাবে এবার ভোটদাতাদের সমর্থন পেতে পারে টিএমসি প্রায় ২ কোটি, বামফ্রন্ট ১.৭৫ কোটি ও বিজেপি ৬৫ লক্ষ (গতবার পেয়েছিল প্রায় ১৯ লক্ষ)। কংগ্রেস ৪৫ লক্ষ, অন্যান্য দলগুলি পাবে ১৫ লক্ষ। জনগণের কথানুযায়ী এবার না জিতলে ভারতীয় জনতা পার্টি অনেক ভোট টানবে। বিজেপি-নির্বাচন প্রার্থীরা প্রত্যেকেই গড়পড়তা ১.২৫ লক্ষের নীচে কেউ ভোট পাবে না। এবার তাই অনেক নামজাদা নির্বাচন প্রার্থীর কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে ভারতীয় জনতাপার্টি— এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশের শহরগুলিতে এবারে ভোট পড়েছে অনেক বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের বেশ কয়েকটি মেট্রোপলিটন শহরে এবারের ভোটপর্ব শেষ হলো। দিল্লী, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর এবং চণ্ডীগড় এই চারটি মেট্রো শহরে কড়া নজরদারির মধ্যে দিয়ে ভোট গ্রহণপর্ব চলে। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় ২০১৪-র ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে ভোট দানের হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনেকটাই বেড়েছে। তবে মুম্বাই-এর তুলনায় চণ্ডীগড় ভোটদানে বেশ খানিকটা এগিয়ে। মুম্বাইয়ে যেখানে ভোট দানের হার ৫২.১৭ শতাংশ সেখানে চণ্ডীগড়ে এই হার ৭৩.৫৭ শতাংশ। সেক্ষেত্রে চেন্নাই শুধু ব্যতিক্রম। কারণ ২০০৯-এর তুলনায় এবারের নির্বাচনে চেন্নাইয়ে ভোট দানের হার ১-২ শতাংশ কম। ২০০৯-এ চেন্নাইয়ে ভোট পড়েছিল ৬২.৮৭ শতাংশ। সেখানে এবারে প্রদত্ত ভোটের হার ৬১.০৮ শতাংশ। আবার চণ্ডিগড়ে যেখানে ছিল ৬৪ শতাংশ, ২০১৪-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩.৫৭ শতাংশে। তবে এযাবৎ ৬ পর্বের নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত সম্পন্ন ভোটপর্বে প্রদত্ত শতাংশ। তবে জাতীয় গড় ভোটের অনুপাতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে দিল্লী। সেখানে ভোটের হার ৬৫.০৯ শতাংশ।

২০০৯-এ মুম্বাইতে ভোটের হার যেখানে ছিল ৪১.৪ শতাংশ সেই তুলনায় এই নির্বাচনে (৫২.১৭ শতাংশ) প্রায় ১১ শতাংশ বেড়েছে। যদিও মুম্বাইবাসীর মনে ২৬/১১-র নরসংহারের ঘটনার স্মৃতি এখনও সতেজ তবু এ নির্বাচনে তা কোনো প্রভাব ফেলেনি। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এনিয়ে যে সমীক্ষা করা হয়েছিল তাতে ভোটদাতাদের উদাসীনতাই এর কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন ভোটাররা যারা কর্পোরেট ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত তারা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার থেকে দিনটাকে ছুটির মেজাজে কাটাতেই বেশি পছন্দ করেছে।

সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও ভোটদানের এই বাড়তি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এই প্রথম— রাজ্যে প্রকৃত অর্থে চতুর্মুখী লড়াই হয়েছে বলে মানছে সব দলই। ৫টি পর্বে অনুষ্ঠিত দশটি কেন্দ্রে ভোটদানের গড় হার ৮১.৮২ শতাংশ।

কয়েকটি শহর ও রাজ্যে ২০১৪ ও ২০০৯-এ শতাংশের ভিত্তিতে ভোট দানের হার

স্থান	২০১৪	২০০৯
মুম্বাই	৫৩.০	৪১.৪
দিল্লী	৬৪.৮	৫২.৩
কর্ণাটক	৬৭.৩	৫৮.০
তামিলনাড়ু	৭৩.০	৬৪.০
কেরল	৭৩.৬	৭৩.৪
বাংলা	৮৩.৮৪	৮১.০৫
মহারাষ্ট্র	৫৫.৩	৪৪.৯
উত্তরপ্রদেশ	৫৮.৫	৪৬.৭
রাজস্থান	৫৯.২	৪৯.৮

সূত্র : নির্বাচন কমিশন

দার্জিলিং	—	৭৫.৯%
আলিপুরদুয়ার	—	৭৯.৪%
জলপাইগুড়ি	—	৮০.৬%
কোচবিহার	—	৮০.৭%
রায়গঞ্জ	—	৭৮.২৭%
বালুরঘাট	—	৮৩.৭১%
মালদহ উত্তর	—	৮১.২৬%
মালদহ দক্ষিণ	—	৮০.৬০%
জঙ্গিপুর	—	৮০.৫৩%
মুর্শিদাবাদ	—	৮৫.২৩%

সূত্র : News.one India in

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

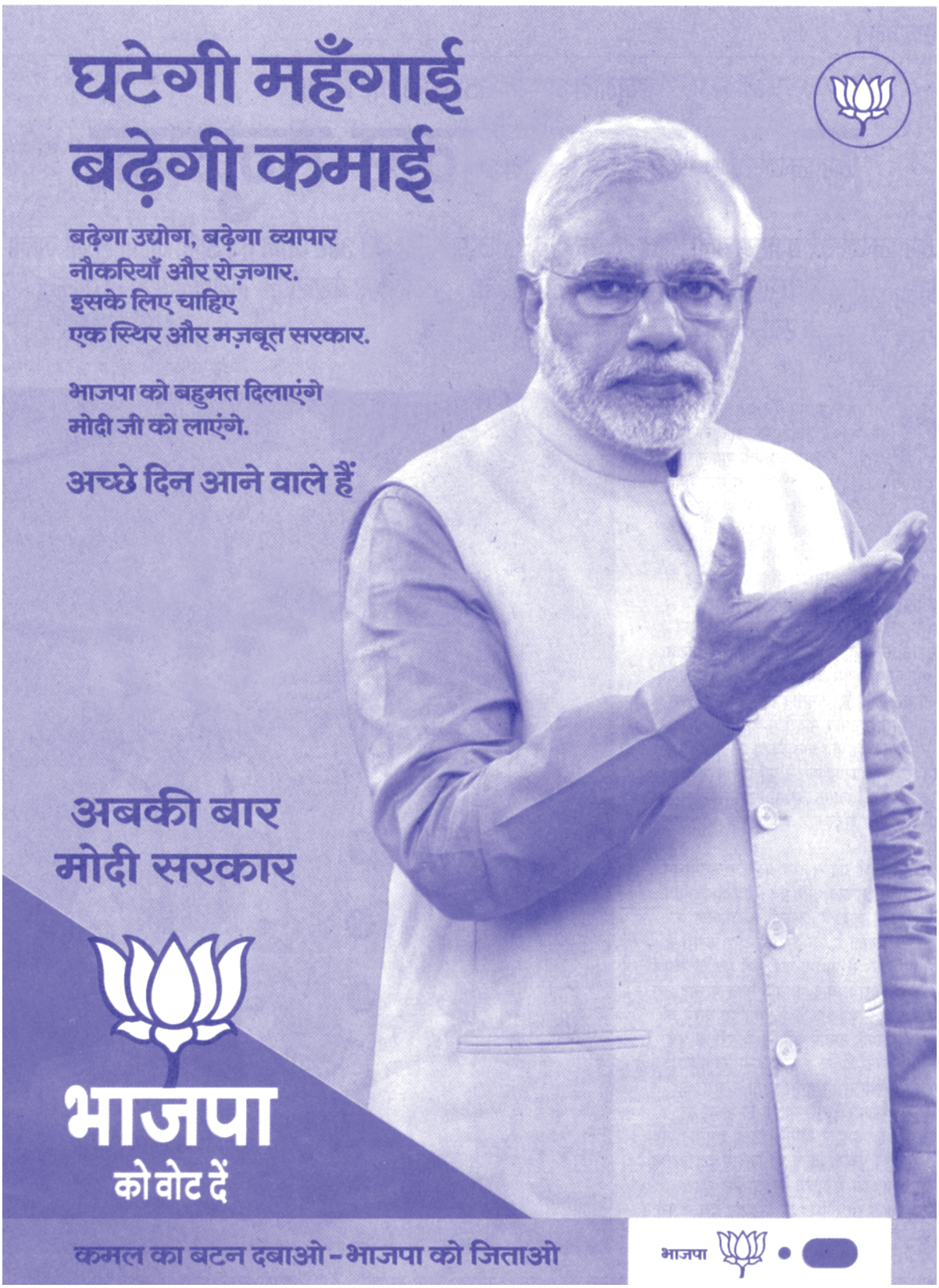

घटेगी महँगाई
बढ़ेगी कमाई
बढ़ेगा उद्योग, बढ़ेगा व्यापार
नौकरियाँ और रोज़गार.
इसके लिए चाहिए
एक स्थिर और मज़बूत सरकार.
भाजपा को बहुमत दिलाएंगे
मोदी जी को लाएंगे.
अच्छे दिन आने वाले हैं
अबकी बार
मोदी सरकार
भाजपा
को वोट दें
कमल का बटन दबाओ – भाजपा को जिताओ
भाजपा

সূর্য্য

সূর্য্য টিউব হল সর্বশ্রেষ্ঠ 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত টিউব

15 বছর* পর্যন্ত চলে

চোখের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক

UPTO 85% সাশ্রয় **

বছরে 600 টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়

** Compared to GLS bulb

* Based on 3.3 hours usage per day with Surya Electronic Ballast

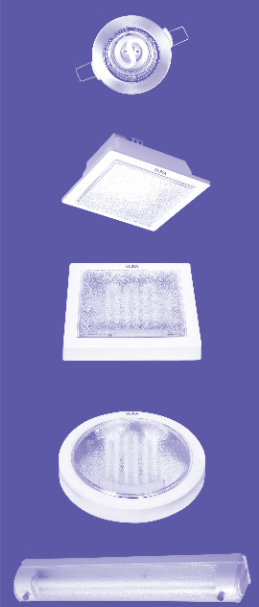

বছরের পর বছর ধরে চলে, মজবুত হওয়ার প্রতিশ্রুতির ফলে

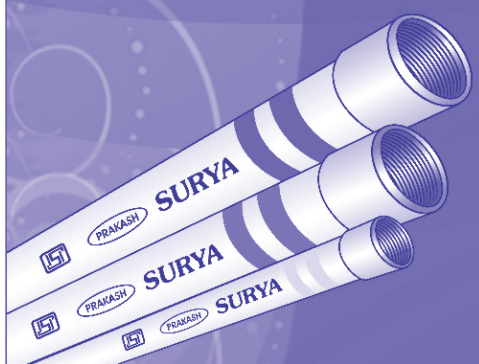

প্রকাশ

সূর্য্য

ষ্টীল পাইপস্

SURYA

Email : consumercare@sroshni.com
Website : www.suryaroshnilighting.com

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

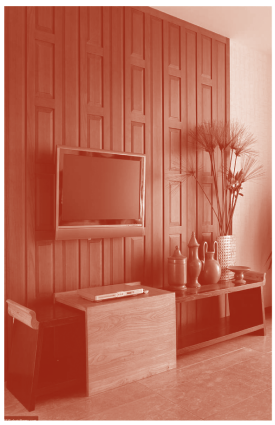

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

প্রথম জাতীয় খেতাব অমৃতার

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের তিরন্দাজি ইভেন্টের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক পরেশ মুখোপাধ্যায় ও প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেট অধিনায়িকা শ্রীরূপা বসুর কন্যা অমৃতা মুখোপাধ্যায়। বাবা তিরন্দাজি, মা ক্রিকেট জগতের সঙ্গে যুক্ত। একমাত্র সন্তান অমৃতা কিন্তু ছোট থেকেই 'চিপ অ্যান্ড চার্জ' গেমের ভক্ত। স্বপ্নমাখানো চোখ দুটি নিয়ে জুলজুল করে দেখত আন্দ্রে আগাসি, মার্টনা হিঙ্কিসদের খেলা টিভিতে। আর নিজেকে সেই স্বপ্নের জগতে ভাসিয়ে নিয়ে যেত টেনিস রথে চাপিয়ে। তার এই টেনিস প্রেম দেখে মা-বাবা আই-এ ভর্তি করে দেন। আই-এ প্রাথমিক শিক্ষাটুকু নিয়ে নিজেকে আরো পরিশীলিত করতে চলে আসেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায় টেনিস অ্যাকাদেমিতে। আর এখানে এসেই তার স্বপ্নের উড়ান ডানা মেলতে শুরু করে।

সাব-জুনিয়র, জুনিয়র স্তরে একের পর এক সাফল্য করায়ত্ত করার পর সম্প্রতি সিনিয়র বিভাগে প্রথম সর্বভারতীয় খেতাব জিতলেন অমৃতা। টেনিস শিক্ষার আঁতুড়ঘর জয়দীপের অ্যাকাদেমিতে এআইটি এর সঙ্গে অ্যাকাদেমির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় র‍্যাঙ্কিং মহিলা টুর্নামেন্টে বাংলার এক নম্বর তারকা শিবিকা বর্মনকে ৩-৬, ৬-৩, ২-০ সেটে হারিয়ে স্বপ্নবৃত্তের একটা বিন্দু রচনা করে নিলেন। এবার তার লক্ষ্য চ্যালেঞ্জার বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে সাফল্যের রথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অমৃতার ফোরহ্যান্ড, ক্রসকোর্ট রিটার্ন রিফ্লেক্স দেখে উচ্ছ্বসিত জয়দীপ-সহ অন্য টেনিস বিশেষজ্ঞরা। নরেশ কুমার থেকে আখতার আলি প্রত্যেকেই মনে করেন সার্ভিস আর ভলিতে আর একটু পাওয়ার আনতে পারলে অমৃতা আন্তর্জাতিক সার্কিটেও সফল হবে। বাবা-মা দুজনেই গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়াব্যক্তিত্ব হওয়ায় বাড়তি সুবিধে। তবে তার জন্য লেখাপড়াতে কোনোরকম ঢিলেমি দেন না। দুটোই সহজে চালিয়ে যাচ্ছেন।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!
অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
5 May - 2014

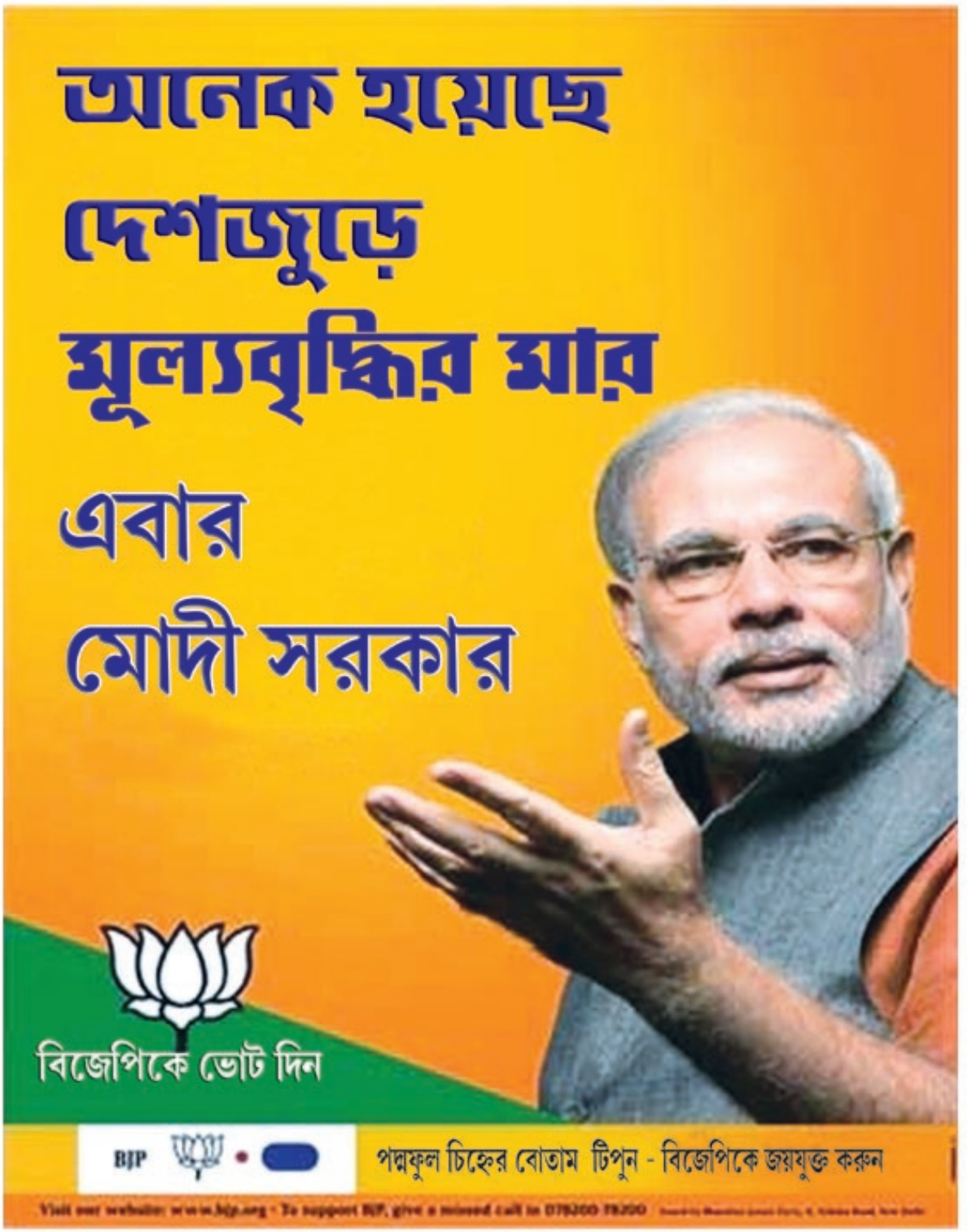

দাম : ১০.০০ টাকা